মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৪, সংখ্যা-০৯

অক্টোবর ২০১৫ ইং, মুহাররম ১৪৩৭ হি., আশ্বিন ১৪২২ বাং | محرم الحرام ١٤٣٧هـ اكتوبر ٢٠١٥م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ
০১১৯১৯১১২২৪

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :..... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১..... ৪
দরসে ফিকহ :
পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল..... ৮
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১৩
মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত :
নববী আদর্শের কিছু নমুনা..... ১৪
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
মসজিদ-সংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল..... ১৭
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আও আদায় করতে হবে ২৫
মুফতী মুহাম্মাদ শফী কাসেমী
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২১..... ২৯
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
হিজরী নববর্ষ ইতিহাসের পুনর্পাঠ..... ৩৫
মাওলানা কাসেম শরীফ
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১৭..... ৩৯
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৪

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

হারাম শরীফ ও মিনা ট্র্যাজেডি : কিছু কথা

হিজরী ১৪৩৬-এর ঘটনাপ্রবাহে সবচেয়ে ভয়াবহ, হৃদয়বিদারক, মর্মান্তিক ও স্পর্শকাতর ঘটনা হলো হারাম শরীফ এবং মিনা ট্র্যাজেডি। সূত্র মতে, বালাদে আমীন তথা নিরাপদ নগরীর মসজিদে হারামে ১১ সেপ্টেম্বর ক্রেন দুর্ঘটনায় ১০৭ জন শহীদ হন। ২৪ সেপ্টেম্বর মিনায় জমরাতের প্রবেশদ্বারে যে দুর্ঘটনা ঘটে, তাতে শহীদ হন ৭৬৯ জন। উভয় ঘটনায় গুরুতর আহতের সংখ্যা অনেক। মিনার দুর্ঘটনাটি শিয়া সম্প্রদায়ের পরিকল্পিত বলে মুসলিম দুনিয়ার দাবি।

এরূপ দুর্ঘটনা-পরবর্তী বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা, মন্তব্য এবং বাহারি প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষা এবং হিকমত অবলম্বনে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে, আবার কেউ দিয়ে থাকে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা। আত্মপক্ষরা থাকে আত্মরক্ষার সীমারেখায় আবদ্ধ, প্রতিপক্ষরা ঘায়েল করার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। তাই এরূপ আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে মন্তব্য আর ব্যাখ্যার সীমা থাকে না। এই ঘটনা দুটির ব্যাপারেও অগণিত ব্যাখ্যা ও মন্তব্য বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

মূল বিষয় হলো, ঘটনা দুটিই মুসলিম উম্মাহের জন্য মর্মস্পর্শী ভয়াবহ দুর্ঘটনা এবং পুরো মানবতার জন্য সতর্কবাণী। বৈশ্বিকভাবে এ ঘটনাকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, আমরা দেখতে চাইব এরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক কারণ হিসেবে আমাদের কোনো ভুল-ত্রুটি সক্রিয় থাকতে পারে কি না।

পবিত্র হারামাইন শরীফাইন দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র, মর্যাদাশীল এবং ফজীলতপূর্ণ স্থান। এসব স্থানে কোনো প্রকার গোনাহ-পাপ করা তো দূরের কথা বরং পাপকাজের কল্পনা করাও কোনো মুসলমানের বেলায় ভাবা যায় না। বরং জ্ঞানহীনতার কারণে বা অজান্তে কোনো গোনাহ হয়ে যাচ্ছে কি না, তার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখাও যায়েরীনে হারামাইনের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়।

হজ হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোচ্চ সামষ্টিক ইবাদত। তাই গোনাহের কাজ তো দূরের কথা, অনেক সাধারণ বৈধ কাজও হজে নিষিদ্ধ।

শরীয়তের এরূপ কঠোরতা সত্ত্বেও আমরা কি পারছি পবিত্র হারামাইনের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করতে? অত্যন্ত খুলুসিয়্যাত ও সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হয়ে হজ পালন করে আমরা নবজাত শিশুর ন্যায় ঘরে ফিরতে সক্ষম হচ্ছি? নাকি জ্ঞানের অভাব এবং গোনাহের কাজকে গোনাহ হিসেবে চিহ্নিত করতে না পেরে কবীরা গোনাহ এবং পাপের বোঝা নিয়ে আমরা ঘরে ফিরছি।

হাদীস শরীফে যেসব কবীরা গোনাহ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অভিসম্পাত, লানত এবং কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো প্রাণীর ছবি অংকন, ছবির সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন। এককথায় প্রাণীর ছবি, ভিডিও ধারণ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন কবীরাহ গোনাহ তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

সম্প্রতি খানায়ে কাবাকে সামনে নিয়ে পবিত্র মাতাফেই একশ্রেণীর গাফেল লোকদের ব্যাপকভাবে সেলফি তোলা এবং ছবি ভিডিওর হিড়িক দেখলে এর লানত সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিদের হৃদয় কেঁপে না উঠে পারে না। হয়তো ছবি ভিডিওর লানত সম্পর্কে অনেকে জানেন না। অজ্ঞাতসারে হোক বা ইচ্ছাকৃত–এরূপ ব্যাপক গোনাহের লানত সকলকে পরিবেষ্টন করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আরেকটি বিষয় হলো নারীর পর্দা। পর্দার সংরক্ষণ ইসলামে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। অথচ মসজিদে হারামের মতো পবিত্র স্থানে তাওয়াফরত অবস্থায় অতি উৎসাহী কিছু কিছু নারীকে পুরুষের ভিড়ে ঢুকে যেতে দেখা যায়। এটা ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃত–সর্বাবস্থায় গোনাহ।

আমাদের জানা মতে, সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে হারাম শরীফে ছবি তোলা ও ভিডিও করার নিষেধাজ্ঞা পূর্ব থেকেই বলবৎ আছে। কিন্তু তা দমন করার পদক্ষেপ কেন নেওয়া হয় না, তা আমাদের জানা নেই।

নারী-পুরুষের ভিড় কমানোর ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের দীর্ঘদিনের পরামর্শ হলো মহিলাদের ব্যাপক হারে হজে না নেওয়া। কারণ হজ ফরজ হয়েছে, এমন মহিলার সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাই একান্ত ইচ্ছা থাকলে মহিলাদের ফাঁকা অবস্থায় উমরাতে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন তাঁরা।

এমনিভাবে আরো কত গোনাহের কাজ ব্যাপকভাবে সংঘটিত হচ্ছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। পবিত্র মক্কা-মদীনায় এরূপ গোনাহের কাজ হওয়াটা স্বয়ং হারামাইনের মর্যাদার ওপর যেমন বড় ধরনের আঘাত, তেমনি পুরো মুসলিম উম্মাহের জন্য অশুভ সংবাদ। এসব থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্নভাবে তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করতেই পারেন।

তবে আমাদের উচিত হবে, যেকোনোভাবে এসব পবিত্র স্থানে সম্পূর্ণ রূপে গোনাহমুক্ত থেকে হারামাইনের পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা করা। বিশেষ করে সৌদি সরকারেরও এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা প্রয়োজন আছে।

আল্লাহ যেন এ দুই ঘটনায় শহীদানদের জান্নাতে সর্বোচ্চ স্থান দান করেন এই কামনায় ...।

আরশাদ রহমানী
৩০/০৯/২০১৫ ইং

উপমহাদেশের শীর্ষ মুরব্বি, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক, মাসিক আল-আবরারের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (দা.বা.) গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। দেশ-বিদেশের বহু উলামায়ে কেরাম, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ছাত্রগণ তাঁকে দেখার এবং দু'আর জন্য মারকাযে আসছেন। মারকাযের পক্ষ থেকে আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ তা'আলা সকলকে উত্তম জাযা দান করুন।

হযরতকে দেখতে আসা কেউ কেউ গোপনে হযরতের ছবি ধারণ করে বিভিন্ন সমাজিক মিডিয়ায় প্রচার করতে দেখা যাচ্ছে। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে বিনা প্রয়োজনে ছবি উঠানো কবীরা গোনাহ। একজন মুমূর্ষু রোগীকে দেখতে এসে এ ধরনের কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক এবং ন্যক্কারজনকও।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٦) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (١٦) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٧)

১৫। হে লোক সকল! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ। ১৬। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। ১৭। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়। ১৮। কোনো বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না, কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তবে তার কিছুই বহন করা হবে না, নিকটাত্মীয় হলেও। তুমি শুধু সতর্ক করতে পারো, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহরই নিকট। (সূরা ফাতির)

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মখলুক হতে অভাবশূন্য, আর সমস্ত মখলুক তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি অভাবমুক্ত এবং সবাই অভাবী। তিনি বেপরোয়া এবং সমস্ত সৃষ্টজীবই তাঁর মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর সামনে হেয় ও তুচ্ছ এবং তিনি মহান প্রতাপশালী ও বিজয়ী। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কারো নড়াচড়ার বা থেমে থাকার ক্ষমতা নেই। এমনকি তাঁর বিনা হুকুমে শ্বাস-প্রশ্বাসেরও কারো অধিকার নেই। সৃষ্টি জগতের সবাই অসহায় ও নিরুপায়। বেপরোয়া অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত একমাত্র আল্লাহ। তিনি যা চান তা-ই করতে পারেন। তিনি যা করেন সব কিছুতেই তিনি প্রশংসনীয়। তাঁর কোনো কাজই হিকমত ও প্রশংসাশূন্য নয়। নিজ কথা ও কাজে নিজ বিধানে, তাকদীর নির্ধারণে। মোটকথা, তাঁর সব কাজই প্রশংসার যোগ্য।

মহান আল্লাহ বলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তোমাদের স্থলে অন্য সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা তাঁর কাছে খুবই সহজ।

কিয়ামতের দিন কেউ তার বোঝা অন্যের ওপর চাপাতে চাইলে তা পূর্ণ হবে না। এমন কেউ সেখানে থাকবে না, যে তার বোঝা বহন করবে। বন্ধু-বান্ধব ও নিকটতম আত্মীয়রা সবাই সেদিন মুখ ফিরিয়ে নেবে। হে লোকেরা! জেনে রেখো যে পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। সেদিন সবারই ওপর একই রকম বিপদ আসবে।

হযরত ইকরামা (রা.) বলেছেন, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর পেছনে লেগে যাবে। সে আল্লাহ তা'আলার কাছে আরজ করবে, হে আল্লাহ! আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন, কেন সে আমা হতে তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল? কাফের মুমিনের পেছনে লেগে যাবে এবং যে ইহসান সে দুনিয়ায় তার ওপর করেছিল, তা সে তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে এবং বলবে, "আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী।" মুমিনও তার জন্য সুপারিশ করবে এবং হতে পারে যে তার শাস্তিও কিছু কম হবে, যদিও জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ অসম্ভব। পিতা পুত্রকে তার প্রতি তার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবে, হে আমার প্রিয় বৎস! সরিষা পরিমাণ পুণ্য আজ তুমি আমাকে দাও।" পুত্র বলবে, "আব্বা! আপনি জিনিস তো অল্পই চাচ্ছেন; কিন্তু যে ভয়ে আপনি ভীত রয়েছেন, সেই ভয়ে আমিও ভীত রয়েছি। সুতরাং আজ তো আমি আপনাকে কিছুই দিতে পারছি না।" তখন সে তার স্ত্রীর কাছে যাবে এবং বলবে 'দুনিয়ায় আমি তোমার প্রতি যে সদ্ব্যবহার করেছিলাম, তা তো অজানা নেই? উত্তরে স্ত্রী বলবে, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, কিন্তু এখন আপনার কথা কী? সে বলবে, আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। আমাকে একটি নেকী দিয়ে দাও, যাতে আমি আজ এই কঠিন আযাব হতে মুক্তি পেতে পারি। স্ত্রী জবাবে বলবে, আপনার আবেদন ও চাহিদা তো খুবই হালকা বটে। কিন্তু যে ভয়ে আপনি রয়েছেন, সে ভয় আমারও কোনো অংশে কম নয়। সুতরাং আজ তো আমি আপনার কোনো উপকার করতে পারব না। কোরআন কারীমের অন্য আয়াতে রয়েছে–

لايجزى والد ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا

'না পিতা পুত্রের কোনো উপকারে আসবে এবং না পুত্র পিতার কোনো উপকারে লাগবে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه

"সেই দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা হতে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে। সেই দিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, হে নবী (সা.)! তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজের কল্যাণের জন্য। ফিরে তো আল্লাহর কাছেই যেতে হবে। তার কাছে হাজির হয়ে হিসাব দিতে হবে। তিনি স্বয়ং আমলের বিনিময় প্রদান করবেন।

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১০

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে যিকির দ্বিতীয় অধ্যায় :

হাদীস নং ১০ :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ "

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, জান্নাতের চাবিসমূহ হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য প্রদান করা। (আততারগীব ওয়াত তারহীব ২৮৫ হা. ২২৬৯, মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/৮২, আল লাআলী [ইমাম সুয়ূতী (রহ.)] ২/২৯০)

হাদীসটির মান : হাসান। (ইমাম সুয়ূতী)

হাদীস নং ১১ :

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :مَا قَالَ عَبْدٌ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا طُلِسَتْ مَا فِي صَحِيفَتِهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى تَسْكُنَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ

যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো সময়–দিনে অথবা রাতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে, তার আমলনামা হতে গোনাহসমূহ মুছে যায় এবং তার স্থলে নেকীসমূহ লিখে দেওয়া হয়। (মুসনাদে আবী ইয়া'লা ৩/৪৪৫ হা. ৩৫৯৯, আততারগীব ২/২৬৮, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৮২ হা. ১৬৮০৩)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

হাদীস নং ১২ :

عَنْ أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ :إِنَّ للّٰه تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عمودا من نور بين يدى العرش فإذا قال العبد لا إله إلّا الله أهتز ذلك العمود .فيقول الله تبارك وتعالى :اسكن .فيقول :كيف أسكن ولم تغفر لقائلها؟ فيقول :إنى قد غفرت له فيسكن عند ذٰلك.

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আরশের সামনে একটি নূরের খুঁটি রয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন ওই খুঁটি দুলতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, থেমে যাও। সে আরজ করে, কিভাবে থামব; অথচ কালেমা পাঠকারীকে এখনও মাফ করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন–আচ্ছা, আমি তাকে মাফ করে দিলাম। তখন ওই খুঁটি থেমে যায়।

(আততরাগীব ২৮৫ হা. ২২৬৯, মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/৮২, আল লাআলী [ইমাম সুয়ূতী] ২/২৯০)

হাদীসটির মান : হাসান (ইমাম সুয়ূতী)

হাদীস নং ১৩ :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلٰى أَهْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْشَةٌ فِي قُبُورِهِمْ، وَلَا مَنْشَرِهِمْ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلٰى أَهْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَهُمْ يَنْفُضُونَ التُّرَابَ عَنْ رُءُوسِهِمْ، وَيَقُولُونَ :الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহওয়ালাদের না কবরে ভয় আছে, না হাশরের ময়দানে। যেন ওই দৃশ্য এখন আমার সামনে ভাসছে যে তারা যখন নিজেদের মাথা হতে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে কবর হতে উঠবে এবং বলবে যে সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি (চিরকালের জন্য) আমাদের ওপর হতে দুঃখ-চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْشَةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَا عِنْدَ الْقَبْرِ

অন্য এক হাদীসে আছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহওয়ালাদের না মৃত্যুর সময় ভয় থাকবে, না কবরে।
(আল আওসাত [তাবারানী] ৮/২৯৪ হা. ৯৪৭৮, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ১/১১০ হা. ১০০, আততারগীব ২ হা. ২২৬৯, জামেউস সাগীর ৪/১৫৩৬ হা. ৭৬২০, মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৩, তারীখে বাগদাদ ৫/৩০ হা. ২৮১৪, আল কামেল [ইবনে আদী] ৪/২৭১ হা. ১১০৫)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একবার হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) আরজ করলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম বলেছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে আপনাকে চিন্তিত ও দুঃখিত দেখছি, এর কারণ কী? (আল্লাহ তা'আলা অন্তরের ভেদ জানেন তবু সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করান।) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, হে জিবরাঈল! আমার উম্মতের চিন্তা খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন তাদের কী অবস্থা হবে। হযরত জিবরাঈল (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, কাফেরদের ব্যাপারে, না মুসলমানদের ব্যাপারে? তিনি বললেন, মুসলমানদের ব্যাপারে চিন্তা হচ্ছে। হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সাথে নিয়ে একটি কবরস্থানে তশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে বনী সালামা গোত্রের লোকদের দাফন করা হয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) একটি কবরের ওপর তাঁর একটি ডানা মারলেন এবং বললেন আল্লাহর হুকুমে উঠে আসো। তৎক্ষণাৎ কবর হতে অত্যন্ত সুন্দর সুদর্শন চেহারাওয়ালা এক ব্যক্তি উঠল এবং সে বলছিল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, নিজের জায়গায় ফিরে যাও। সে ফিরে গেল। অতঃপর অন্য এক কবরে তাঁর অপর ডানা মারলেন এবং বললেন, আল্লাহর হুকুমে উঠে আসো। তৎক্ষণাৎ কবর হতে একজন অত্যন্ত কালো কুশ্রী নীল চক্ষুবিশিষ্ট লোক উঠে দাঁড়াল এবং সে বলছিল, হায় আফসোস! হায় লজ্জা! হায় মুসীবত! হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, নিজের জায়গায় ফিরে যাও। সে ফিরে গেল। অতঃপর জিবরাঈল (আ.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আরজ করলেন, এই সকল লোক যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে (হাশরের দিন) সেই অবস্থায়ই উঠবে।

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ :يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الرَّبَّ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَهُوَ يَقُولُ :مَا لِي أَرَاكَ مَغْمُومًا حَزِينًا وَهُوَ أَعْلَمُ بِه.
فَقَالَ :يَا جِبْرِيلُ قَدْ طَالَ تَفَكُّرِي فِي أَمْرِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
قَالَ :يَا مُحَمَّدُ فِي أَمْرِ أَهْلِ الْكُفْرِ أَمْ فِي أَمْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ؟
قَالَ :يَا جِبْرِيلُ لَا بَلْ فِي أَمْرِ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ .
قَالَ :فَأَخَذَ بِيَدِهِ حَتَّى أَقَامَهُ عَلَى مَقْبَرَةٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَضَرَبَ بِجَنَاحِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى قَبْرٍ مَيِّتٍ فَقَالَ :قُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ فَقَامَ رَجُلٌ مُبْيَضُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَقُولُ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ :عُدْ فَعَادَ كَمَا كَانَ ثُمَّ ضَرَبَ بِجَنَاحِهِ الْأَيْسَرِ عَلَى قَبْرِ مَيِّتٍ يَقُولُ :وَاحَسْرَتَاهُ وَانْدَامَتَاهُ وَاسَوْأَتَاهُ.
فَقَالَ لَهُ :عُدْ.
فَعَادَ كَمَا كَانَ.
ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ :هَكَذَا يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا مَاتُوا عَلَيْهِ

(তাম্বীহুল গাফেলীন ৩৬৩ হা. ৬৩৬)

খ.

এক হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি ১০০ বার করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন অবস্থায় উঠাবেন যে তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, যাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে তরতাজা থাকে তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ ,مِائَةَ مَرَّةٍ إِلَّا بَعَثَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ,وَلَمْ يُرْفَعْ لِأَحَدٍ يَوْمَئِذٍ عَمَلٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ

(মুসনাদে শামিয়্যীন [তাবরানী] ২/১০৩ হা. ৯৯৪, জামেউল মাসানীদ ১৩/৬৮৭ হা. ১১২৭৪, দুররে মনসূর ৪/৬৩, আততারগীব ২/২৯৫, জামেউস সগীর ৪/১৫৪৬ হা. ৭৬৭৩, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৯৬)
হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং ১৪ :

سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِنَّ اللّٰهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الخَلَائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ :لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ :أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ :لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ : بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ :احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ :يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ :إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ "، قَالَ :فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ شَيْءٌ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে হতে এক ব্যক্তিকে বাছাই করে সমস্ত হাশরবাসীর সামনে ডাকবেন এবং তার সামনে আমলের ৯৯টি দফতর খুলবেন। প্রতিটি দফতর এত বড় হবে যে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত (অর্থাৎ যত দূর দৃষ্টি যায়) প্রসারিত হবে। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি কি এই সমস্ত আমলনামার কোনো কিছুকে অস্বীকার করো? আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত আমার ফেরেশতারা কি তোমার ওপর কোনো জুলুম করেছে? (কোনো গোনাহ না করা সত্ত্বেও লিখেছে কিংবা করার চেয়ে বেশি লিখেছে?) সে আরজ করবে, না। (অর্থাৎ, না অস্বীকার করার কিছু আছে, আর না ফেরেশতারা জুলুম করেছে।) অতঃপর প্রশ্ন করা হবে, এই সমস্ত গোনাহের পক্ষে তোমার নিকট কোনো ওজর আছে কি? সে আরজ করবে, কোনো ওজর নেই। ইরশাদ হবে–আচ্ছা, তোমার একটি নেকী আমার নিকট আছে। আজ তোমার ওপর কোনো জুলুম করা হবে না। অতঃপর একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে, যাতে লেখা থাকবে : আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। ইরশাদ হবে, যাও একে ওজন করে নাও। সে আরজ করবে, এতগুলো দফতরের মোকাবিলায় এই সামান্য কাগজের টুকরা কি কাজে আসবে। ইরশাদ হবে, আজ তোমার ওপর জুলুম করা হবে না। অতঃপর ওই সমস্ত দফতরকে এক পাল্লায় রাখা হবে আর অন্যদিকে কাগজের ওই টুকরাটি রাখা হবে। তখন ওই কাগজের টুকরার ওজনের মোকাবিলায় দফতরওয়ালা পাল্লাটি শূন্যে উড়তে থাকবে। আসল কথা হলো এই যে আল্লাহর নামের চেয়ে ভারী আর কোনো জিনিস নেই।
(সুনানে তিরমিযী ৫/২৫ হা. ২৬৩৯, সুনানে ইবনে মাজাহ ৪/৫১৭ হা. ৪৩০০, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ১/২৬৪ হা. ২৮৩, সহীহে ইবনে হিব্বান ১/৪৬১ হা. ২২৫, মুসনাদে আহমদ ২/২১৩ হা. ২৯৯৪, শরহুস সুন্নাহ ১৫/১৩৩ হা. ৪৩২১, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৬ হা. ৫২৯, ১৯৩৭)
হাদীসটির মান : সহীহ

ক.

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুই ব্যক্তি ছিল–একজন আবেদ, আরেকজন গোনাহগার। উক্ত আবেদ ব্যক্তি ওই গোনাহগার ব্যক্তিকে সর্বদা তিরস্কার করত। সে বলত, আমাকে আমার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও। একদিন আবেদ রাগান্বিত হয়ে বলে ফেলল, আল্লাহর কসম! তোর কখনো মাগফেরাত হবে না। আল্লাহ তা'আলা উভয়কে রূহের জগতে একত্রিত করলেন এবং গোনাহগারকে রহমতের আশা করত বলে মাফ করে দিলেন। আর আবেদকে এরূপ কসম খাওয়ার পরিণতিতে আজাবের হুকুম দিলেন। নিঃসন্দেহে তা জঘন্যতম কসম ছিল।

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " :كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ، وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ :أَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ :أَقْصِرْ، فَقَالَ :خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ :وَاللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ، فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ :أَكُنْتَ بِي عَالِمًا، أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ :اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ

بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ :اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ "قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ

(আবু দাউদ ৫/২০৭ হা. ৪৯০১, মুসনাদে আহমদ ২/৩২৩ হা. ৮২৯২, সহীহে ইবনে হিব্বান ১৩/২০ হা. ৫৭১২, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৫/২৮৯ হা. ৬৬৮৯)

হাদীসটির মান : সহীহ

খ.

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে যারা কাউকেও গোনাহ করতে দেখে শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাধা দেয় না, তারাও ওই ব্যক্তির সাথে গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে, আযাবে শরীক হবে।

عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ :مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِمْ وَلَا يُغَيِّرُوا، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا

(সহীহে ইবনে হিব্বান ১/৫৩৬ হা. ৩০০, মুসনাদে আহমদ ৪/৩৬৪ হা. ৩৬৬, সুনানুল কুবরা [বায়হাকী] ১০/৯১)

হাদীসটির মান : হাসান

গ.

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিদ'আতীকে সম্মান করে, সে ইসলামকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সাহায্য করে।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ

(আল মু'জামুল কাবীর ২০/৯৬ হা. ২৮৮, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৭/৬১ হা. ৯৪৬৪, আল কামেল [ইবনে আদী] ২/৩২৪ হা. ৪৫৬, তারিখে ইবনে আসাকির ১৪/৪ হা. ১৪৭৯, হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/৯৭)

হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।

ঘ.

হাদীসে এসেছে, শেষ যামানায় বহু দাজ্জাল, ধোঁকাবাজ ও মিথ্যাবাদী বের হবে, যারা তোমাদেরকে এমন এমন হাদীস শোনাবে, যা তোমরা কখনো শোনোনি। এমন যেন না হয় যে, এ সকল লোক তোমাদের গোমরাহ করে ফেলে এবং ফেতনায় ফেলে দেয়।

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ، وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ

(সহীহ মুসলিম ১/১২ হা. ৭)

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং ১৫ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ الله فَمَنْ قَالَهَا فِي صِحَّةٍ؟ قَالَ :تِلْكَ أَوْجَبُ، وَأَوْجَبُ ثُمَّ قَالَ :وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ جِيءَ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ، وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ، وَمَا تَحْتَهُنَّ فَوُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى لَرَجَحَتْ بِهِنَّ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ওই পাক জাতের কসম, যার হাতে আমার জান, যদি সমগ্র আসমান-যমিন ও এর মাঝে যত মানুষ আছে এবং যত জিনিস তার মাঝে আছে এবং যত কিছু এর নিচে আছে সমস্তই এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তবুও এর ওজন ভারী হয়ে যাবে। (আল মু'জামুল কাবীর ১২/২৫২ হা. ১৩০২৪, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ২/৩২৩)

হাদীসটি মুরসাল।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার পাক নামের সমতুল্য কোনো বস্তুই নেই। হতভাগা ও বঞ্চিত ওই সমস্ত লোক, যারা একে হালকা মনে করে। তবে এর মধ্যে ওজন এখলাছের দ্বারা পয়দা হয়। এখলাছ যত হবে, ততই এই পাক নামের ওজন ওজনী হবে।

এক হাদীসে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন করো। কেননা, যে বক্তি মৃত্যুর সময় এই কালেমা পড়ে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কেউ সুস্থ অবস্থায় এই কালেমা পড়ে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তবে তো আরো বেশি জান্নাত ওয়াজিবকারী।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দরসে ফিক্বহ

পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল

মুফতী শাহেদ রহমানী

পোশাকের শরয়ী নীতিমালা :

পোশাক ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্য, সভ্যতা ও লজ্জাশীলতার পরিচায়ক। মানুষ পোশাক পরিধানের তাগিদ অনুভব করেছিল সেই আদিম আমলেই। আদিম থেকে আধুনিক–সব যুগেই আছে পোশাকের কদর। হোক না তা গাছের পাতা কিংবা সুতোয় বোনা কাপড়। তাই লাজুকতায় বশীভূত হয়ে লজ্জাস্থান ঢাকার প্রবণতা প্রাকৃতিক। মানুষ বিবস্ত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু নগ্নতার চাদর ছুঁড়ে ফেলে খুব শিগগিরই সে নিজেকে পোশাকের আবরণে ঢেকে ফেলে। এ চেতনাবোধ স্বভাবজাত। ইসলাম মানুষের স্বভাবজাতধর্ম। ফিতরতের চাহিদার বিপরীত কোনো নির্দেশনা ইসলামে নেই। স্বভাবধর্ম ইসলামে পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। পোশাককে আরবীতে 'লিবাস' বলা হয়। যার অর্থ পরিহিত বস্তু, যা পরিধান করা হয়।

পোশাকের পারিভাষিক অর্থ :

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় লেবাস ও পোশাক বলা হয়, যা মানুষের সতর ঢেকে দেয়, লজ্জাস্থানকে আবৃত করে ফেলে। ফিক্বাহ শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতারে' বলা হয়েছে : هو مايستر العورة (رد المحتار ٦/٣٥١) অর্থাৎ : 'পোশাক বলা হয়, যা লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখে।' ন্যূনতম এতটুকু পরিমাণ পোশাক পরিধান করা ফরজ। কোরআনের ভাষ্য থেকেও পোশাকের এ সংজ্ঞা বোঝা যায়। কোরআন বলছে : يوارى سوآتكم (الاعراف ٢٦) অর্থাৎ : এ পোশাক তোমাদের লজ্জাস্থান আচ্ছাদিত করে ফেলে। (সূরা আ'রাফ : ২৬)

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, ইসলামী শরীয়তে পোশাক বলতে ওই বস্ত্র খণ্ডকে বোঝায়, যা লজ্জাস্থানকে ঢেকে ফেলে। যে পোশাক লজ্জাস্থানকে পুরোপুরি আবৃত করে না, কিংবা এতই সূক্ষ্ম, মসৃণ, পাতলা ও সংকীণ হয় যে, এর ফলে ঢেকে রাখার অঙ্গ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়, শরীয়ত এমন বস্ত্রকে পোশাক বলেই স্বীকৃতি দেয় না। এরই সঙ্গে আরেকটি জরুরি বিষয় হলো, পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে কিছুতেই শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম করা যাবে না। পোশাকের রং, গুণ-বৈশিষ্ট্য, পরিধানের ধরন ও পদ্ধতিতে যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, কিছুতেই সেগুলোর ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধ যথাযথ অনুসরণ করে পোশাক পরিধান করলেই কেবল তা 'লেবাসে শরয়ী' বা ইসলামসম্মত পোশাক বলে পরিগণিত হবে।

শরয়ী পোশাকের গুণ-বৈশিষ্ট্য :

ইসলামী শরীয়ত মানুষের জন্য যে পোশাক মনোনীত করেছে, তার বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামসম্মত পোশাক বলতে সেই পোশাককে বোঝায়, যা লজ্জাস্থান আবৃতকারী, মানানসই, সাদৃশ্যবর্জিত, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, বিলাসিতা বিবর্জিত, অহংকারমুক্ত, পরিচ্ছন্ন এবং (পুরুষের বেলায়) সেটি লাল, জাফরান, উছফুর (এক প্রকার গুল্ম, যা থেকে হলুদ রং পাওয়া যায়) ও ওর্স (এক ধরনের রঙের গাছ) ইত্যাদি রঙের হতে পারবে না।

সতর আবৃতকারী পোশাক বলতে বোঝায়, যে পোশাক সতরের অঙ্গগুলোকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে। কাপড় এমন মসৃণ ও পাতলা হতে পারবে না যে, এতে করে পোশাকের অভ্যন্তর অঙ্গই দেখা যায়। কাপড় ঢিলেঢালা হওয়া উচিত। শর্টকাট, আঁটসাঁট পোশাক বিবস্ত্রতার নামান্তর।

দ্বিতীয়ত, পোশাকটি শালীনতা, সৌজন্যতা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হওয়া চাই। যুতসই, মানানসই পোশাক পরিধানই ইসলামের দাবি। মহান আল্লাহ বলেন : خذوا زينتكم عند كل مسجد (الاعراف)

এখানে আল্লাহ তা'আলা পোশাক বোঝাতে 'যিনত' তথা 'সৌন্দর্য' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এতে পোশাক সৌন্দর্যমণ্ডিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে :

ان الله جميل يحب الجمال (مسلم ٩١)

অর্থাৎ : আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। (মুসলিম শরীফ : ৯১)

এক সাহাবী মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন : আমার শখ হলো, আমার কাপড় উন্নতমানের হোক, আমার জুতাজোড়া অভিজাত হোক–এটা কি অহংকারপ্রসূত? রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ (مسلم ١٤٧[٩١])

অর্থাৎ : নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ

সৌন্দর্য পছন্দ করেন (সৌন্দর্যের প্রকাশ অহংকার নয়)। ওই ব্যক্তি অহংকারী, যে সত্যের সামনে ঔদ্ধত্ত দেখায় আর মানুষদের তুচ্ছজ্ঞান করে, অবজ্ঞা করে। (মুসলিম শরীফ ১৪৭ [৯১])

তৃতীয়ত, পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে অন্যের সাদৃশ্য বর্জন করা। তিনটি বিষয়ে সাদৃশ্য অবলম্বনের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এক. কাফের-মুশরিকদের পোশাক গ্রহণ করা যাবে না। দুই. ফাসেক-পাপাচারীদের মতো পোশাক পরিধান করা যাবে না। তিন. বিপরীত লিঙ্গের মতো পোশাক ধারণ করা যাবে না। অর্থাৎ পুরুষের জন্য নারীদের ন্যায় আর নারীদের জন্য পুরুষের ন্যায় পোশাক পরিধান করা জায়েয নয়।

চতুর্থত, রেশমি কাপড় পরিধান করা যাবে না। এটি পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। নারীদের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান করা বৈধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন :

حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتى واحل لأناثهم (ترمذى ١٧٢٠)

অর্থাৎ : আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য রেশমি কাপড় এবং স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। কিন্তু মহিলাদের জন্য তা হালাল। (তিরমিযী শরীফ : ১৭২০)

পঞ্চমত, পোশাকটি লাল রঙের হতে পারবে না। এটিও পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। কেননা তাদের জন্য গাঢ় লাল রঙের পোশাক পরিধান করা মাকরূহ। তবে হালকা লাল রঙের পোশাক পরিধান করা বৈধ। (রদ্দুল মুহতার : ৬/৩৫৮, কাশফুল বারী : কিতাবুল লেবাস : ২০৯)

ষষ্ঠত, উক্ত পোশাক জাফরান, উছফুর ও ওর্‌স রঙের হতে পারবে না। উছফুর এক ধরনের হলুদ রঙের ফুল, যা পানিতে মিশ্রিত করে কাপড় রঙিন করা হয়। আরবে এর প্রচলন ছিল। ওর্‌সও একটি ফুলের নাম, যা কাপড় রঙিন করার কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে রঙিন পোশাক পরিধানের নিষেধাজ্ঞাও কেবল পুরুষদের জন্য। এ বিষয়ে ফুক্বাহায়ে কেরামের ভাষ্য নিম্নরূপ :

ويكره للرجل ان يلبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران والورس (عالمكيرى ٣٣٢/٥)

يكره للرجل لبس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر (رد المحتار ٣٥٨/٦)

সপ্তমত, বিলাসিতা পরিহার করতে হবে। সীমাতিরিক্ত বিলাসিতার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়া কাফেরদের অভ্যাস। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন :

اياك والتنعم ، فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين (مسند احمد : ٢٢١٠٥)

অর্থাৎ : বিলাসিতা পরিহার করো। আল্লাহর নেক বান্দারা বিলাসী জীবন যাপন করে না। (মুসনাদে আহমদ : ২২১০৫)

অষ্টমত, পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে অপচয় ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ বিষয়ে উদাসীনতা কাম্য নয়। কোরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يا بنى آدم خذوا زينتكم عندكل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين (الاعراف ٣١)

অর্থাৎ : হে আদম সন্তান! যখন তোমরা মসজিদে আসবে, তখন নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশক বস্তু (পোশাক) নিয়ে এসো। আর অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ : ৩১)

নবমত, অপচয় যেমন নিন্দনীয়, কৃপণতাও অনুরূপ নিন্দনীয়, বর্জনীয়। তাই নিজের ব্যক্তিত্ব ও সামর্থ্য অনুসারে পোশাক পরিধান করা উচিত। এ বিষয়ে হুজুর আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন :

ان الله يحب ان يرى أثر نعمته على عبده (ترمذى ٢٨١٩)

অন্য হাদীসে এসেছে :

فان الله عزوجل اذا أنعم على العبد نعمة أحب ان ترى عليه (طبرانى صغير ٤٨٩)

উভয় হাদীসের মূল কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে যে পরিমাণ নেয়ামত দিয়ে সিক্ত করেছেন, তার প্রভাব-প্রতিরূপ তিনি বান্দার মধ্যে দেখতে ভালোবাসেন।

এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে নিম্নমানের পোশাক পরিধান করে উপস্থিত হন। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমার কি অর্থকড়ি, সহায়-সম্পত্তি নেই?' সাহাবী বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে তো আল্লাহ অঢেল সম্পত্তি দান করেছেন।' তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

فليرى عليك مارزقك الله (طبرانى كبير ٧٧٩/١٧)

অর্থাৎ আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদ তোমার শরীরে দৃশ্যমান হওয়া উচিত। (তাবারানী কবীর : ১৯/৯৭৯)

দশমত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি ইসলাম সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। সাফ-সুতরা, পরিপাটি ও সুন্দরভাবে জীবনযাপন ইসলামের শিক্ষা। বিশেষত, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধানের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। এক ব্যক্তির মাথায় অগোছাল ও এলোকেশ দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

اما يجد هذا مايسكن به شعره (مستدرك حاكم ٧٣٨٠)

অর্থাৎ : এই ব্যক্তি কি কোনো কিছু (তেল ইত্যাদি) খুঁজে পায় না, যা তার চুলগুলোকে জমিয়ে রাখে, গুছিয়ে রাখতে সহযোগিতা করে?

ময়লাযুক্ত কাপড় পরিহিত অন্য একজনকে দেখে তিনি বলেছেন :

اما يجد ما ينقى به ثيابه

অর্থাৎ : তার কি কিছু নেই, যা দিয়ে সে নিজের কাপড়চোপড় ধুয়ে নিতে পারে?

পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য :

পবিত্র কোরআনে পোশাক পরিধানের গুরুত্বপূর্ণ দুটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এক. সতর ঢেকে ফেলা। দুই. সৌন্দর্যের প্রকাশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يابنى آدم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا (الاعراف ٢٦)

অনুবাদ : হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের পোশাকের বিধান দিয়েছি, যে পোশাক তোমাদের লজ্জাস্থান ঢেকে ফেলে এবং সৌন্দর্যের পরিচায়ক। (সূরা আ'রাফ : ২৬)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শায়খুল ইসলাম আল্লামা ত্বকী উসমানী (দা. বা.) লিখেছেন : উল্লিখিত আয়াতে পোশাকের গুরুত্ব বোঝানোর পাশাপাশি এটাও বলা হয়েছে যে পোশাকের প্রকৃত উদ্দেশ্য অঙ্গের আচ্ছাদন। এরই সঙ্গে সেটি সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতার প্রতীকও বটে। আর সর্বোত্তম পোশাক হলো, যা উভয় গুণের সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত। (আসান তরজমায়ে কোরআন)

নতুন পোশাক পরিধানের দু'আ থেকেও পোশাক পরিধানের উল্লিখিত উদ্দেশ্যদ্বয় বোঝা যায়। দু'আটি নিম্নরূপ :

الحمد لله الذى كسانى ماأوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى (ترمذى ٣٥٦٠)

অর্থাৎ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে স্বীয় লজ্জাস্থান আবৃতকারী পোশাক পরিধান করিয়েছেন আর এর মাধ্যমে আমি জীবনকে সাজিয়ে তুলি। (তিরমিজী শরীফ : ৩৫৬০)

পোশাকের প্রকারভেদ, বিধিনিষেধ :

পোশাক প্রথমত দুই প্রকার। এক. বাহ্যিক বা দৃশ্যমাণ পোশাক। দুই. অভ্যন্তরীণ বা অন্তরের পোশাক। বাহ্যিক পোশাক দেহকে ঢেকে ফেলে। আর অভ্যন্তরীণ পোশাক অন্তরের কলুষতা, অপবিত্রতাকে ঢেকে দেয়। আল-কোরআনের পরিভাষায় সেটিকে 'লিবাসুত্ তাকওয়া' বা 'খোদাভীরুতার পোশাক' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পোশাকের এই দ্বিতীয় প্রকারটিই সর্বোত্তম পোশাক। আবার আহকাম ও বিধিনিষেধ হিসেবে পোশাক পাঁচ প্রকার। ফরজ, মোস্তাহাব, মাকরূহ, হারাম ও মুবাহ।

ফরজ পোশাকের সংজ্ঞা হলো :

مايستر العورة ويدفع الحر والبرد

অর্থাৎ : এতটুকু পরিমাণ পোশাক পরিধান করা ফরজ, যার মাধ্যমে লজ্জাস্থান আবৃত করা যায় এবং শীত-গ্রীষ্মের প্রভাব থেকে বাঁচা যায়।

মোস্তাহাব পোশাক বলতে বোঝায়,

هو مايحصل به أصل الزينة وإظهار النعمة

অর্থাৎ : লজ্জাস্থান আবৃত করার পাশাপাশি সে পোশাক সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতার পরিচায়ক, সামাজিক ও ধর্মীয় অন্যান্য অনুষ্ঠানে পরিহিত পোশাকগুলোও মোস্তাহাব পোশাকের অন্তর্ভুক্ত। তবে তাতে আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের লেশমাত্র থাকতে পারবে না।

মাকরূহ পোশাক বলা হয়,

هو اللباس الذى يكون مظنة للتكبر والخيلاء

অর্থাৎ : এমন পোশাক পরিধান করা মাকরূহ, যা পরিধান করলে অহংকার আসার আশংকা থাকে। মানুষের কাছে তাকে অহংকারী মনে হয়। আবার প্রভাবশালী, সামর্থ্যবান লোকদের জন্য নিজেদের সামর্থ্য, ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ জীর্ণ, পুরনো, নিম্নমানের পোশাক পরিধান করাও 'মাকরূহ'। কেননা প্রকারান্তরে এটি আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের শামিল।

হারাম বা নিষিদ্ধ পোশাকের সংজ্ঞা দিয়ে ফুক্বাহায়ে কেরাম বলেছেন :

هو اللبس بقصد الكبر والخيلاء

অর্থাৎ : অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করা হারাম। এ কারণে পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় পরিধানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

মুবাহ পোশাকের সংজ্ঞা হলো :

وهو ما عدا ذلك (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٢٨/٦ اتحافات شرح الشمائل : ٩٣، رد المحتار ٣٥١/٦)

অর্থাৎ : ওপরে উল্লিখিত পোশাক ছাড়া অন্য সব ধরনের পোশাক পরিধান করা মুবাহ ও জায়েয।

তাকওয়ার পোশাক, পোশাকের তাকওয়া :

পবিত্র কোরআনে 'লিবাসুত্ তাকওয়াকে' সর্বোত্তম পোশাক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 'লিবাসুত্ তাকওয়া' কী- তাফসীর গ্রন্থগুলোতে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। যেমন–ঈমান, লজ্জাশীলতা, আল্লাহর ভয়, নেক আমল, সৎপথে পরিচালিত হওয়া, সতর ঢাকা ইত্যাদি। (তাফসীরে ত্বাবী : ১২/৩৬৬-৩৬৮) উল্লিখিত ব্যাখ্যাগুলোর আলোকে লিবাসুত্ তাকওয়া'র একটি সামগ্রিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায়। ঈমান আনার পর লজ্জাশীলতায় বশীভূত হয়ে শরীয়ত নির্ধারিত সতরের অঙ্গগুলো বাহ্যিকভাবে ঢেকে ফেলা। অন্তরে আল্লাহর ভয় নিয়ে নেক আমলের জিন্দেগী গ্রহণ করে নিজেকে সৎপথে পরিচালিত করা এবং সে পথে চলতে সব বাধা, প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে লড়াই করাকে 'লিবাসুত্ তাকওয়া' বলা হয়।

তাকওয়ার পোশাকের গুরুত্ব :

ইসলাম অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম নয়। লৌকিকতা ও মোনাফেকিরও স্থান নেই এখানে। বাহ্যিকতার পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতার বড়ই কদর এ ধর্মে। একই কথা পোশাকের ক্ষেত্রেও। দেহের

পোশাকের পাশাপাশি তাকওয়ার জামা দিয়ে নিজ অন্তরকে সাজিয়ে নেওয়া জরুরি। এটাই আসলে আসল জামা, যা মানুষকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে পৃথক করে রাখছে। অন্তর যদি 'বিবস্ত্র' থাকে, দেহের বস্ত্র তখন নির্লজ্জতাকে রোধ করতে পারে না। তাই তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম পোশাক।

ভেতর-বাহির যেন অভিন্ন হয়, এ জন্য নবী করীম (সা.) তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন। কেননা কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মানুষের ভেতরের সঙ্গে বাইরের, বাইরের সঙ্গে ভেতরের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইরশাদ হয়েছে :

يخرج فى اخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون الناس جلود الضأن من اللين السنتهم احلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب (ترمذى: ٢٤٠٤)

অনুবাদ : শেষ যামানায় এমন সব লোক বের হবে, যারা ধর্মকে পুঁজি করে দুনিয়া কামাই করবে। নম্রতা প্রকাশ করার জন্য ভেড়ার খাল (পশমি বা সুতি জামা) পরিধান করবে। তাদের ভাষা মধু থেকেও মিষ্ট হবে। কিন্তু তাদের অন্তর নেকড়ের ন্যায় (হিংস্রতাপূর্ণ) হবে। (তিরমিজী শরীফ : ২৪০৪)

ভারসাম্যপূর্ণ পোশাক পরিধানের তাগিদ :

ইসলাম একটি মধ্যপন্থী ধর্ম। ইসলামের প্রতিটি বিধানই ভারসাম্যপূর্ণ। সংকোচন কিংবা সীমালঙ্ঘন এখানে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাই ইসলাম পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য রক্ষা করার তাগিদ দিয়েছে। অধিক বিলাসী পোশাক পরিধান করা যাবে না। আবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ নিম্নমানের পোশাকও পরিধান করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনাচার এমনই ছিল। উম্মতকে দেওয়া তাঁর শিক্ষাও এমনই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিলাসী পোশাক পরিধান করতেন না। যা পাওয়া যেত, তা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। অন্যদিকে কোনো সাহাবীকে সামর্থ্যের চেয়ে নিম্নমানের পোশাক পরিধান করতে দেখে সতর্ক করেছেন। আল্লাহর নেয়ামতের প্রকাশ ঘটানোর শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীস শরীফে এসেছে :

عن عبد الله ابن عمرؓ ان رسول الله ﷺ نهى عن لبستين : المشهورة فى حسنها ، والمشهورة فى قبحها (طبرانى كبير ١٣/٣٣١ رقم ١٤١٣٥)

তরজমা : রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই ধরনের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। এক. সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত পোশাক। দুই. নিকৃষ্টতা ও নিম্নমানের জন্য আলোচিত-সমলোচিত পোশাক।

عن ابى هريرةؓ وزيد بن ثابتؓ ان النبى ﷺ نهى عن الشهرتين، فقيل يارسول الله وما الشهرتان؟ رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد (شعب الايمان ٥٨٢١)

তরজমা : রাসূলুল্লাহ (সা.) পোশাকের ক্ষেত্রে দুই ধরনের খ্যাতি থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে খ্যাতিদ্বয় কী? জবাবে তিনি বলেছেন, কাপড় অধিক পাতলা হওয়া, বেশি মোটা হওয়া, বেশি লম্বা হওয়া, দেহ-অবয়বের তুলনায় ছোট হওয়া। কিন্তু এতদ্বয়ের মধ্যে মধ্যপন্থা, মিতাচার ও ভারসাম্য রক্ষা করে পোশাক পরিধান করা উচিত।

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়, মানুষের জন্য ব্যয়বহুল, বিলাসী পোশাক পরিধান করা অনুচিত। কেননা এতে মানুষের আত্মপ্রচার, অহংকার ও ঔদ্ধত্য বেড়ে যায়। আবার নিজের সামর্থ্যের চেয়েও নিম্নমানের পোশাক পরিধান করা কাম্য নয়। কেননা এতে আল্লাহর অকৃজ্ঞতা প্রকাশ পায়। হাদীস শরীফে এসেছে :

ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده (ترمذى ٢٨١٩)

অর্থাৎ : আল্লাহ স্বীয় নেয়ামতের নিদর্শন বান্দার মধ্যে দেখতে পছন্দ করেন। (তিরমিজী : ২৮১৯)

সাদাসিধা জীবনযাপনের গুরুত্ব :

অহংকার ও আত্মপ্রচারে অভিলাষী না হয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করা বৈধ। বরং মোস্তাহাব। যেমনটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ বাস্তবতাও স্মরণ থাকা চাই যে, ভারসাম্য রক্ষা করে বিনয়ী পোশাক পরিধান করা উত্তম। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের পোশাক সাদাসিধা, অকৃত্রিম ছিল। তাঁরা বিনয়ী পোশাক পরিধান করতেন। লৌকিকতাবর্জিত জীবনাচারে অভ্যস্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেছেন,

من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعا كساه الله حلة الكرامة (ابو داود ٤٧٧٨)

তরজমা : যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনয়াবত হয়ে সুন্দর পোশাক পরিহার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের পোশাক পরিধান করাবেন। (আবু দাউদ : ৪৭৭৮)

عن ابى بردة قال: اخرجت الينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت : قبض رسول الله ﷺ فى هذين (ترمذى ١٧٣٣)

তরজমা : হযরত আবু বুরদাহ (রহ.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) আমাদের নিকট একটি মোটা জটবদ্ধ চাদর এবং মোটা কাপড়ের লুঙ্গি নিয়ে আসেন এবং বলেন : এই দুই কাপড়েই মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকাল হয়েছে। (তিরমিজী : ১৭৩৩)

عن عائشةؓ قالت انما كان فراش النبى ﷺ الذى ينام عليه آدم حشوه ليف

عن ابى هريرةؓ لقد رأيت سبعين من اصحاب الصفة مامنهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء قد ربطوا فى اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية ان ترى عورته (بخارى ٤٤٣)

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি ৭০ জন আসহাবে সুফ্ফার সদস্যকে দেখেছি, যাঁরা পুরো শরীর ঢেকে রাখার মতো বস্ত্র জোগাড় করতে পারতেন না। পোশাক বলতে কারো কারো কেবল একটি লুঙ্গি ছিল। আর কারো কেবল জামা ছিল। তাঁরা সেগুলো গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন। কোনোটা টাখনু অবধি, কোনোটা টাখনু ও হাঁটুর মাঝামাঝি পড়ে থাকত। লজ্জাস্থান প্রদর্শিত হওয়ার ভয়ে তাঁরা জামাগুলো হাত দিয়ে ধরে রাখতেন। (বুখারী : ৪৪৩)

عن الحسن : قال خطب عمر وهو خليفة وعليه ازار فيه اثنتا عشرة رقعة (شرح السنة للبغوى ١٢/٤٥)

তরজমা : হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, হযত ওমর (রা.) খেলাফতের মসনদে সমাসীন অবস্থায় একবার খুতবা দিয়েছেন, তখন তাঁর পরিহিত লুঙ্গিটি বারোটি তালিযুক্ত ছিল। উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, পোশাক-পরিচ্ছেদ ছাড়াও জীবনের সব ক্ষেত্রে সাদাসিধা জীবানাচার কাম্য। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবন পদ্ধতিও ছিল খুবই মামুলি। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)ও তাঁর আদর্শ অনুসারে নিজেদের জীবনকে সাজিয়েছেন। খলীফা হয়ে রাষ্ট্রের সমুদয় বিত্তবৈভবের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা নবীজির আদর্শবিচ্যুত হননি। সাধারণ জীবনযাপনই ছিল তাঁদের আজীবন সাধনা।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য। আর আলোচ্য হাদীসটি সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য।

طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله، اشعث رأسه مغبرة قدماه (بخارى ٢٨٨٦)

তরজমা : ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম টেনে আল্লাহর পথে বের হয়েছে। তাঁর চুলগুলো বিক্ষিপ্ত, পাগুলো ধূলায় ধূসরিত। (বুখারী শরীফ : ২৮৮৬)

ان النبى ﷺ قال: ليس لابن آدم حق فى سوى هذه الخصال، بيت يسكنه وثوب يوارى عورته وجلف الخبز والماء (ترمذى : ٣٣٤١)

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, তিন ধরনের সম্পদে মানুষের চূড়ান্ত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বসবাসের ঘর, লজ্জাস্থান আবৃতকারী পোশাক ও দানাপানি। (তিরমিজী : ২৩৪১)

عن عبد الله قال: نام رسول الله ﷺ على حصير ، فقام وقد اثر فى جنبه فقلنا يارسول الله ! لو اتخذنا لك وطاء فقال: مالى ولى الدنيا ما انا فى الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها (ترمذى ٢٣٧٧)

তরজমা : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) চাটাইয়ের ওপর ঘুমিয়েছেন। ঘুম থেকে ওঠার পর দেখা গেল, তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের চিহ্ন লেগে আছে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য (নরম) বিছানা সংগ্রহ করে দেব? জবাবে তিনি বলেছেন, দুনিয়ার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। দুনিয়ায় আমার অবস্থান মুসাফিরের ন্যায়, যে নাকি ভ্রমণক্লান্ত হয়ে বৃক্ষের ছায়ায় এসেছে। তারপর বিশ্রাম শেষে সেটা ছেড়ে চলে গেছে। (তিরমিজী : ২৩৭৭)

(ترمذى ١٧٦١)

তরজমা : হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) যে বিছানায় নিদ্রা যেতেন, তা ছিল চামড়ার তৈরি। এর মধ্যে খেজুরগাছের আঁশ ভরা ছিল। (তিরমিজী : ১৭৬১)

عن عائشةؓ قالت: قال لى رسول الله ﷺ إذا أردت اللحوق بى فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، واياك ومجالسة الاغنياء لا تستخلقى ثوبا حتى ترقعيه (ترمذى ١٧٨٠)

তরজমা : হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছেন, যদি তুমি পরকালে (মর্যাদার দিক থেকে) আমার পাশে থাকতে চাও, তাহলে তিনটি বিষয়ের ওপর আমল করবে। এক. দুনিয়াতে তোমার জন্য মুসাফিরের মতো প্রয়োজনীয় পাথেয় যথেষ্ট হোক। দুই. বিত্তশালীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবে। তিন. পট্টি, তালি ও পুনর্বার সেলাই করা ছাড়া কাপড়কে পরিত্যক্ত করে দেবে না। (তিরমিজী : ১৭৮০)

ذكر اصحاب رسول الله ﷺ يوما عنده الدنيا فقال رسول الله ﷺ الاتسمعون الا تسمعون ان البذاذة من الايمان ان البذاذة من الايمان يعنى التقحل (ابو داود ٤١٦١)

তরজমা : একবার সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে দুনিয়া নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। মহানবী (সা.) বললেন, তোমরা কি শোনোনি, তোমরা কি শুনতে পাওনি, সাদাসিধা জীবনযাপন ঈমানের অংশ। অকৃত্রিম জীবনাচার ঈমানের অঙ্গ। (আবু দাউদ : ৪১৬১)

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত হাদীসের সঙ্গে আল্লাহর নেয়ামত নিজের মধ্যে প্রকাশ করার হাদীসের সঙ্গে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা নেয়ামত প্রকাশের হাদীসটি নেতৃস্থানীয়, সামর্থ্যবান,

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

কারো থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য মুহাব্বত ও আকীদত দুটিই জরুরি :
মুহাব্বত আর আকীদত উভয়টি ভিন্ন বস্তু। কারো থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য উভয়টিই প্রয়োজন। অর্থাৎ শায়খের প্রতি মুহাব্বতও থাকতে হবে, আকীদতও থাকতে হবে।

মাতা-পিতার সাথে সবার মুহাব্বত থাকে। কিন্তু সব মাতা-পিতার ওপর সব সন্তানের আকীদত থাকে না। সে কারণে অনেক সন্তান মাতা-পিতার অবাধ্য হয়।

নিজের কাজ করতে থাকো :
দু'আ কবুলে বিলম্ব হওয়ার মধ্যে আল্লাহর হেকমত নিহিত থাকে। সুতরাং তুমি দু'আ করতেই থাকো। অধীর হয়ো না। বেশি চিল্লায়ো না, আওয়াজ যেন বেশি না হয়। শুধু দু'আ করতেই থাকো।

کھولیں وہ یا نہ کھولیں دراس پہ ہو کیوں تری نظر
تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا

দরজা খুলুক বা না খুলুক তাতে তোমার দৃষ্টি থাকবে কেন?
তুমি নিজের কাজ করেই যাও। অর্থাৎ দু'আ করতেই থাকো।

প্রশ্ন হতে পারে, সেই হেকমত কী? আপনি তো আল্লাহ তা'আলার সামনে এমন কিছু নন যে, হেকমতও বলেদিতে হবে। হেকমত জানার প্রয়োজন হয় না। তবে যে মহান সত্তা না চাইলেও দিয়ে থাকেন। সে সত্তা চাওয়ার পরও দেবেন না, তা হতে পারে না।

আবার এও করো না যে কিছুদিন দু'আ করে তারপর দু'আ বন্ধ করে দেবে। কারণ এতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারাজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। কারণ এই কারণে আল্লাহর ব্যাপারে এরূপ অভিযোগের মতো হয়ে যায় যে আমরা তো দু'আ করছি আপনি তা কবুল করছেন না। (নাউজুবিল্লাহ) এটি আল্লাহর শানের খেলাপ।

দু'আ কবুর হওয়ার হাকীকত :
দু'আ কবুল হওয়ার হাকীকত হলো আল্লাহর বিশেষ করুণা ধাবিত হওয়া। কোনো কোনো সময় বান্দা যে বিষয়ের কামনা করে তা প্রাপ্ত হয়। আবার কোনো সময় তার চেয়ে ভালো বস্তু প্রাপ্ত হয়। এরূপ বিষয় তো দুনিয়াতেও হয়। যেমন–শিশু মাতা-পিতার কাছে কোনো বস্তুর জন্য জেদ করতে লাগল। উক্ত বস্তু যদি সন্তানের জন্য ক্ষতিকর হয় তবে মাতা-পিতা তা কখনো তাকে দেয় না। বরং তাকে অন্য উত্তম বস্তু দিয়ে খুশি করার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে যদি কেউ বলে আমি যা চাইলাম তা তো পেলাম না। অথচ যা পাওয়া গেছে, তার সামনে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর কীই বা মূল্য?

আমাদের কাজ হলো আল্লাহর কাছে চাওয়া :
সুতরাং চাওয়ার মধ্যে যেন কমতি না হয়। বরং সব সময় দু'আ করতে থাকা। কবুল করা না করা তো আল্লাহরই কাজ। এটি তোমার দায়িত্ব নয়। তোমার ওপর যে দায়িত্ব সেটা তুমি পূর্ণ করো। কবুল করা না করার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা বান্দার নম্রতা চান। যদিও দু'আ কবুলই হলো না কিন্তু এই নম্রতাই তার জন্য কল্যাণকর হবে।

দু'আ কেন কবুল হয় না?
দু'আ কবুল হয়নি, হতে পারে তাতে ত্রুটি ছিল, কমতি ছিল। সুতরাং দু'আর মধ্যে খুবই নম্র হওয়ার বিষয়টি লক্ষ রাখতে হবে। ছোট ও নম্র হওয়ার অর্থই হলো নিজের পছন্দনীয় বিষয়কে ছেড়ে দেওয়া। নিজের পছন্দকে কোনো মূল্য না দেওয়া। বরং বড়রা যা পছন্দ করেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

তাবলীগের জন্য দয়া ও উদারতা প্রয়োজন :
হযরত বলেন, ইসলামের তাবলীগ বেশির ভাগ স্নেহ-মমতা ও উদারতার মাধ্যমে হয়েছে। স্নেহ-মমতার মাধ্যমে শিক্ষার আদান-প্রদান ভালোভাবে হয়। আকর্ষণ ও সম্পর্ক গাঢ় হয়। সুতরাং যার মধ্যে স্নেহ-মমতা ও উদারতার কমতি থাকবে, সে তা অর্জন করার চেষ্টা করো। কারো সর্দি-কাশি হলে তা থেকে নিষ্কৃতির জন্য যেমন চেষ্টা করা হয়, তেমনি কারো মধ্যে যদি অসচ্চরিত্রের কোনো অনুষঙ্গ বিদ্যমান থাকে, তা দূর করার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

তা'লীম-তারবিয়্যাত উভয়টিই জরুরি :
মানুষের জন্য তা'লীম-তারবিয়্যাত দুটিই জরুরি। তারবিয়্যাতের মাধ্যমে যেমন অবস্থার পরিবর্তন হয় তালীমের মাধ্যমেও অবস্থার পরিবর্তন হয়। কারণ ইলমের মাধ্যমে রাস্তা জানা যায়। জ্ঞানের ভুলগুলো শুধরে যায়। কোনো কোনো সময় ইলমে কমতি থাকে, অনেক সময় ভ্রান্ত ইলম হয়, এর ভেতর যদি সঠিক বিষয়ের জ্ঞান অর্জিত হয় তবে ইলমের ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়।

আমলের ভ্রান্তি দূর করার তরীক্বা :
কিছু ভ্রান্তি আছে আমলী। এর জন্য স্বতন্ত্র মেহনতের প্রয়োজন আছে। কোনো লেখা দেখলেই সেরূপ করে লেখে ফেলা যায় না বরং এর জন্য অনুশীলন প্রয়োজন এবং তা শিক্ষা করা আবশ্যক। তেমনি অন্যের আমল দেখেই নিজে আমল করতে পারে না বরং তাও শিখতে হয়।

আমলের জন্য শক্তির প্রয়োজন :
ইলম এক জিনিস, আমল ভিন্ন জিনিস। আমলের জন্য অন্তরে জযবা এবং আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হতে হয়। আর ইলমের মাধ্যমে অন্তরে রওশনী পয়দা হয়। আমলের জন্য শক্তির প্রয়োজন। দৈহিক আমল হলে দৈহিক শক্তির প্রয়োজন। রূহানী আমলের জন্য জন্য রূহানী শক্তির প্রয়োজন।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

নববী আদর্শের কিছু নমুনা

اخـــــــلاق (শিষ্টাচার) শব্দটি মনে পড়লেই মানসপটে এমন একটি চিত্র ও কাঠামো ভেসে ওঠে, যা প্রত্যেকেই নিজের করে নিতে চায়। কারণ শিষ্টাচার মানুষের এমন বৈশিষ্ট্য, যার মধ্যে এই গুণ পাওয়া যাবে, সে-ই পূর্ণাঙ্গ মানব, শিষ্টাচার এমন পথ্য, যা মন ও দেমাগ উভয়কে সুস্থ ও সতেজ রাখে। দেখুন রাসূল (সা.) শিষ্টাচারকে ইলম ও ইবাদতের অলংকার সৌন্দর্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিয়ামতের দিন মুমিনের আমলনামায় হুসনে আখলাক তথা উত্তম শিষ্টাচারের চেয়ে ভারী ও মসৃণ কোনো আমল থাকবে না। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

ان اثـقـل شئ يوضع فى ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن

কিয়ামতের দিন মুমিনের মিযানে আমলে সবচেয়ে ভারী যে জিনিসটি হবে তাহলো খুলুকে হাসান বা উত্তম শিষ্টাচার। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

অনুরূপভাবে একজন মুমিন হুসনে আখলাক-উত্তম শিষ্টাচারের বদৌলতেই লাগাতার রোজা ও নামায আদায় করার মর্যাদা পেয়ে থাকে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

ان الـمـؤمـن ليـدرك بـحسـن خلقـه درجة قائم الليل وصائم النهار

একজন মুমিন খুলুকে হাসানের বদৌলতে তাহাজ্জুদগুজার ও রোজাদারের মর্যাদা পেয়ে থাকে। (আবু দাউদ)

ভালো-মন্দের পার্থক্য ও শিষ্টাচারের মাধ্যমেই করা হয়। নাওয়াস বিন সাম'আন (রা.) বলেন,

سألت رسول الله ﷺ عن البر والاثم فـقـال: البـر حسـن الـخـلق والاثم مـاحاك فى صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس

আমি রাসূল (সা.)-কে নেকী ও মন্দের মাঝে পার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূল (সা.) বলেন, নেকী বলতে হুসনে খুলুক উত্তম চরিত্রকে বোঝানো হয়, আর মন্দ সেটাই, যা তোমার অন্তরে খটকা-দ্বিধা সৃষ্টি করে এবং এ বিষয়ে মানুষের জেনে যাওয়া অপছন্দনীয় ভাবো। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

ان من خياركم احسنكم اخلاقا

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে যে শিষ্টাচারে সবার ওপরে। (বুখারী, মুসলিম)

রাসূল (সা.)-এর শিষ্টাচার

মহান শিষ্টাচার রাসূল (সা.)-এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, এই ধরাতে নবীগণের আগমন আখলাকের তা'লীমের জন্য, আর রাসূল (সা.) এই ধারার সর্বশেষ রাসূল। বিষয়টি এভাবে বোঝার চেষ্টা করুন যে কোরআনের চিন্তাধারা হলো আখলাক বা শিষ্টাচার, আর রাসূল (সা.) হলেন সেই আদর্শ ও শিষ্টাচারের মডেল। মতবাদ ও চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে কমবেশি হয়ে থাকে-এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আখলাক ও শিষ্টাচারের চিন্তাধারা যতটুকু বিবেকসম্মত ও দৃঢ় হয় আখলাকের নমুনাও ততটুকু দৃঢ় ও মজবুত হয়। এ কারণেই বিশ্বের অধিকাংশ চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে শিষ্টাচারের শিক্ষাদান দৃষ্টি নন্দিত। তবে তাঁদের কাছে গেলে দেখা যায়, তাঁদের চিন্তা-চেতনা আর বাস্তবতার মাঝে যোজন যোজন দূরত্ব। কথা আর কাজের মধ্যে অমিল দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। ব্যতিক্রম শুধু রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব। তাঁর কথা যেমন পবিত্র, তেমনি তাঁর কাজকর্মও পবিত্র। তাঁর শিক্ষা যেমন আলোকময়, তেমনি তাঁর চরিত্র, আদর্শ ও শিষ্টাচার প্রস্ফুটিত। কোথাও কোনো খুঁত পাবে না। সন্দেহ নেই একমাত্র রাসূলই (সা.) এই সম্মানের যোগ্য অধিকারী। কারণ উত্তম আদর্শ ও শিষ্টাচারের এমন কোনো দিক নেই, যা তাঁর মধ্যে নেই।

লজ্জা

লজ্জা-শরম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে পরিগণিত। রাসূল (সা.)-এর বাস্তব জীবনে এর প্রভাব কিভাবে প্রোথিত ছিল হযরত আয়েশা (রা.)-এর এই উক্তি থেকেই তা অনুমেয়। তিনি বলেন,

كـان النبى ﷺ اشد حياء من العذراء في خدرها

একটি পর্দানশীন অবিবাহিত কুমারী মেয়ের চেয়েও রাসূল (সা.) বেশি লাজুক ছিলেন। (বুখারী)

হায়া-শরম মুসলিম নর-নারীর সোপান, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

الـحيـاء لايـأتـى الا بخير وفى رواية: الحياء خير كله

হায়া-শরম কল্যাণকেই বয়ে আনে,

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, লজ্জা জিনিসটাই কল্যাণকর। (বুখারী, মুসলিম)

লাজ-শরম না থাকলে কাউকে কুকুরের চরিত্রে দেখা গেলেও বৈচিত্র্যের কিছু নেই। কারণ লজ্জা জিনিসটিই মানুষ আর জীবজন্তুর মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ক। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

اذا لم تستحى فاصنع ماشئت

'হায়া-শরম বলতে কোনো কিছু না থাকলে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারো।' (বুখারী)

বর্তমান যুবসমাজ ও নব প্রজন্মের চারিত্রিক অধঃপতনের মূলে কি বেহায়াপনা নয়? অবশ্যই। সন্দেহ নেই!

রাগ দমন করা

রাগ দমন করা বড়মাপের একটি চারিত্রিক গুণ। বছরের পর বছর সাধনা করেও এর অর্জন কষ্টসাধ্য। রাগ দমনের নসীহত করা অতি সহজ, তবে কাজে বাস্তবায়ন অনেক কঠিন। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর মধ্যে এ গুণটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিদ্যমান ছিল, সুস্থ মস্তিষ্কে গভীর মনোযোগ সহকারে রাসূল (সা.)-এর সীরাত অধ্যায়ন করলে পদে পদে এর মেছাল পাওয়া যাবে।

হযরত যয়নব (রা.)-এর ঘটনা

ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত যে রাসূল (সা.)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা.) গর্ভাবস্থায় মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের জন্য একটি উষ্ট্রীতে আরোহণ করে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে হাব্বার বিন আসওয়াদ নামক এক ব্যক্তি বর্ষার আঘাতে তাঁকে উষ্ট্রপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে ফেলে দেয়, আঘাতের প্রচণ্ডতায় অকালে তাঁর গর্ভপাত ঘটে। অবর্ণনীয় এই কষ্টকে সঙ্গী করে একসময় তিনি ইহমায়া ত্যাগ করেন। রাসূল (সা.) যখন এই দুর্ঘটনার সংবাদ পান যারপরনাই রাগান্বিত হন এবং অত্যন্ত মনোকষ্টে ভোগেন। এই দুর্ঘটনার কথার স্মরণ হলেই রাসূল (সা.) অশ্রু সজল হয়ে যেতেন। কিন্তু যখন হাব্বার বিন আসওয়াদ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অতীত কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, রাসূল (সা.) তাকে ক্ষমা করে দেন।

ওয়াহশী বিন হারব (রা.)-এর ঘটনা

ওয়াহশী একটি নাম, যে নামটি ইসলামী ইতিহাসের একটি তিক্ত অধ্যায়ের স্মারক। তিনি রাসূল (সা.)-এর প্রিয় চাচা হযরত হামযা (রা.)-কে উহুদ প্রান্তে শহীদ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্য পরোয়ানা জারি ছিল, কিন্তু যখন ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হন, রাসূল (সা.) তাঁর মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণ করাকে সাদরে কবুল করেন। অতঃপর হযরত হামযা (রা.)-কে কিভাবে তিনি শহীদ করেন এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। হযরত ওয়াহশী (রা.) হৃদয়বিদারক এ ঘটনার বিবরণ প্রদান করেন, এতদ্বশ্রবণে রাসূল (সা.) ফুঁফিয়ে কান্না শুরু করেন। তবে নিজেকে সংযত রেখে রহমতে দু'আলম (সা.) ঘোষণা করেন, ওয়াহশী তোমার অপরাধ মার্জনা করা হলো। তবে তুমি আমার সম্মুখে আসবে না। কারণ তোমাকে দেখলে আমার প্রিয় চাচার কথা স্মরণ হয়ে যায়।

অঙ্গীকার পূরণ

বিশ্বস্ততা ও অঙ্গীকার পূরণ করা ঈমান ও মানবিক গুণ, যে অঙ্গীকার পূরণে বিশ্বস্ত হবে না, সে নিঃসন্দেহে পূর্ণ মানবতা ও ঈমান থেকে বঞ্চিত। কোরআনে কারীমে বিশ্বাসঘাতকতাকে বিতাড়িত ইহুদীদের আর অঙ্গীকার পূরণ করাকে মুমিন, মুত্তাকী এবং নবীদের গুণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। রাসূল (সা.)-এর আখলাকে হাসনার মধ্যে একটি এটিও ছিল যে রাসূল (সা.) সদা অঙ্গীকার রক্ষা করতেন, ভঙ্গ করতেন না।

আবু রাফে (রা.)-এর ঘটনা

আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু রাফে (রা.)-এর একটি ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন, কোনো এক কাজে কুরাইশের লোকেরা আমাকে রাসূল (সা.)-এর খেদমতে প্রেরণ করে। (তখন ও তিনি মুসলমান হননি) যখন আমি রাসূল (সা.)-এর দর্শন লাভ করি সাথে সাথে আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতঃপর রাসূল (সা.)-এর খেদমতে আরজ করলাম! আল্লাহর কসম! আমি এখান থেকে মক্কায় ফিরে যাব না। তখন রাসূল (সা.) বলেন,

انى لا اخيس بالعهد ولا احبس البرد ولكن ارجع فان كان فى نفسك الذى فى نفسك الا ن فارجع

'আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করি না, বিশ্বাসঘাতকতা করি না, আর দূতকেও আটকে রাখি না। অতএব এখন তুমি ফিরে যাও, তবে তোমার এই আগ্রহ, আশা ও মনোবাসনা যদি তখনো বলবৎ থাকে, তবে ফিরে এসো। আবু রাফে (রা.) বলেন, আমি তখন ফিরে আসি তবে পরবর্তীতে রাসূল (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হই।' (আবু দাউদ)

ইটের জবাবে পুষ্পমালা

রাসূল (সা.) আখলাকে হাসানার দ্বারা অস্থির মানবতার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। চির শত্রুর প্রতিও পাথরের জবাবে পুষ্পমালা অর্পণ করেন। ঘৃণার অন্ধকার রাজ্যে প্রেম-ভালোবাসার আলো ছড়িয়ে

দেন। পরস্পরের দলাদলি এবং স্থায়ী শত্রুতার মূলোৎপাটন করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এখানেই শেষ নয়, মক্কা বিজয়ের ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখুন, বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশের সেই দৃশ্যটি কল্পনা করুন, যখন দশ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার অন্তরে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, এমনকি অনেকে হুংকার ছেড়ে ঘোষণা করলেন اليـــوم يوم الملحمة

আজ প্রতিশোধের দিন! আজ তলোয়ার বাজির দিন! জুলুমের ক্ষত শুকানোর দিন! মনের জ্বালা মেটানোর দিন! কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, আসমান ও যমীন সাক্ষী, সেদিন এমন কিছুই ঘটতে দেওয়া হয়নি। রহমতে নববী তরঙ্গায়িত হলো আর যবানে রিসালতের এই আওয়াজ মক্কাবাসীর কানে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল–

لاتثريب عليكم اليوم واذهبوا انتم الطلقاء

'যাও! তোমরা মুক্ত! তোমাদের থেকে কোনো বদলা নেওয়া হবে না, প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।' এমনই ছিল রাসূল (সা.)-এর চারিত্রিক মহানুভবতা এবং শিষ্টাচারের নমুনা। কিয়ামত পর্যন্ত যার উপমা পেশ করতে এই পৃথিবী অপারগ।

রাসূল (সা.) বিশ্ব মানবতার সামনে আদর্শের সর্বোচ্চ নমুনা পেশ করেন, যার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কোরআনে প্রদান করেন–

انك لعلى خلق عظيم

"নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।"

এক জায়গায় রাসূল (সা.) নিজেই ইরশাদ করেন, انـمـا بعثـت لاتمم مكارم الاخلاق

'আমাকে তো চারিত্রিক গুণাবলির পূর্ণতার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।' এটাকেই হযরত আয়েশা (রা.) এভাবে ব্যক্ত করেন,

كان خلقه القرآن

'রাসূল (সা.)-এর চরিত্র অবিকল কোরআনের ন্যায়।'

পরিশেষে কথা হলো, রাসূল (সা.)-কে খালেকে কাওনাইনের পক্ষ থেকে যে চারিত্রিক গুণাবলি প্রদান করা হয়েছে এবং যা সম্পূর্ণকরণের জন্য তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, তা মুকাল্লাফ সৃষ্টির স্বভাবজাত চাহিদার উপযোগী। এসব গুণাবলির উদ্দেশ্য শুধু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উচ্চ শিখরে পৌঁছা নয়। বরং সা'আদাতুত দারাইনের সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নববী আদর্শে আদর্শবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন

গ্রন্থনা : মুফতী নুর মুহাম্মদ

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

মসজিদ-সংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

মসজিদের সীমানা নির্ধারিত থাকা চাই

মসজিদ শুরুর সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত, যাতে নতুন লোকেরাও সঠিক স্থান থেকে মসজিদে ঢোকার ও বের হওয়ার দু'আ পড়তে সক্ষম হয়। অনেক মসজিদে এ ব্যাপারে পেরেশানি উঠাতে হয়। বারান্দা মসজিদে শামিল কি না বোঝা যায় না। সুতরাং কোনো খাম্বা ইত্যাদিতে লিখে রাখতে হবে যে "মসজিদ এখান থেকে শুরু।" (ইবনে মাজা হাদীস নং ৭৭৩)

মসজিদের গেটে দু'আ লিখলে তিনটি লিখবে

মসজিদের গেটে মসজিদে ঢোকার দু'আ লিখতে চাইলে পূর্ণ তিনটি বা ইস্তিগফারসহ চারটি লিখবে। অনুরূপভাবে বের হওয়ার সময়ের সব কটি দু'আ লিখবে। বর্তমানে প্রায় মসজিদে ঢোকা ও বের হওয়ার একটি করে দু'আ লেখা হয়। এরূপ করা ঠিক নয়। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। লোকেরা মনে করে মাত্র এটুকুই মসজিদে ঢোকার ও বের হওয়ার দু'আ। (ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩১৪)

ওজুখানা তৈরির পদ্ধতি

১. মসজিদের ওজুখানা এমনভাবে নির্মাণ করবে, যাতে পানি অপচয় না হয়, নতুবা এর গোনাহ প্রত্যেক মুসল্লী পৃথকভাবে পাবে। আর মসজিদ কর্তৃপক্ষের ওপর গোনাহের সমষ্টি বর্তাবে। (সূরায়ে বনী ইসরাঈল, আয়াত নং ২৭)

এ ওজু দ্বারা নামায জায়েয হলেও অপচয়ের কারণে মারাত্মক গোনাহ হবে। সুতরাং মসজিদের হাউস থাকা ভালো। আর যদি টেপ সিস্টেম হয় তাহলে হয়তো তার সাথে বদনা রাখবে অথবা এমন টেপ লাগানো যায়, যেখানে হাত সরানোর সাথে সাথে পানি বন্ধ হয়ে যায়। অথাবা লিখিতভাবে এবং মৌখিকভাবে মুসল্লীদের বারবার বোঝাতে থাকবে, যাতে তারা ওজু করার সময় টেপ প্রয়োজন মতো বারবার খুলবে এবং বারবার বন্ধ করবে। একবার খুলে ওজু সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবে না। তাহলে আশা করা যায় পানির অপচয় বন্ধ হবে। (সূরা মায়েদা : ২, তিরমিজী, হা: নং ২৬৭৫)

২. মসজিদের মুসল্লীদের খেদমত ও আরামের জন্য প্রত্যেক মসজিদের নিজস্ব প্রস্রাবখানা ও পায়খানা থাকা জরুরি। মসজিদ কমিটির জন্য এর ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরি। এবং এগুলো সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে এবং রাখার জন্য কোনো খাদেম নিয়োগ দেবে। প্রস্রাবখানা দিয়ে ওজুখানার পানি প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবে। যাতে এগুলো থেকে কোনো দুর্গন্ধ না ছড়ায়। এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। (সূরায়ে তাওবা, আয়াত নং ১০৮)

অনেক মসজিদে তো এগুলোর কোনো ব্যবস্থাই করা হয় না, যা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করে, আবার অনেক এলাকায় মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে এগুলো তৈরি করা হয় এবং সাফাইয়ের উত্তম ব্যবস্থা করা হয় না, এমনকি যারা জরুরত পুরা করতে সেখানে যায়, তারা নাপাক হয়ে ফিরে আসে এবং এগুলো থেকে দুর্গন্ধ ছাড়ায়। এমনকি মসজিদ থেকেও দুর্গন্ধ অনুভব করা যায়। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিজী, হা: নং ১৮০৬)

মসজিদে আরামদায়ক বিছানা থাকা উচিত

মসুল্লীদের কষ্ট হয়, এমন কাজ করতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শক্তভাবে নিষেধ করেছেন। (তিরমিজী, হা: নং ২৪৬-৪৭)

সুতরাং মসজিদে মুসল্লীদের জন্য আরামদায়ক বিছানার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবে। পূর্ণ মসজিদে সম্ভব না হলে অন্তত দুই অথবা চার কাতারে এ ব্যবস্থা করবে। তাও সম্ভব না হলে বয়স্ক মুসল্লীদের জন্য কিছুসংখ্যক মুসল্লা নির্ধারণ করে দেবে। যাতে তারা আরামের সাথে নামায আদায় করতে পারেন। জওয়ানরা বৃদ্ধদের এ

সমস্যা বুঝতে সক্ষম নয়, তাই তারা গরমের মৌসুমে সকল বিছানা উঠিয়ে ফেলতে চায়–এটা ঠিক নয়।
মসজিদের জন্য দুই সেট বিছানা রাখবে, যাতে করে একটা পরিষ্কার করার সময় অপরটা বিছানো যায়। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ২১২, আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩৩৫, ৩৮২২)

সামনের দেয়ালে কিছু লেখা বা অংকন করা নিষেধ

মসজিদের সামনের দেয়ালে কিছু লিখবে না বা লেখা টাঙাবে না। এবং রংবেরঙের নকশা ও কারুকার্য করবে না। এতে মুসল্লীদের নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়, যা নামাযের রূহ। জরুরি কোনো লেখা টাঙাতে হলে দুই পাশের দেয়ালে বা পেছনের দেয়ালে তার ব্যবস্থা করবে। (দূররে মুখতার : ১/৬৫৮)

মেহরাবের মাসায়েল

১. মেহরাবের মধ্যে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান কাতারের ঠিক মাঝখানে যেন হয়, এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। সুতরাং উভয় পার্শ্বের মুসল্লী যাতে সমান হয়। নতুবা বিনা ঠেকায় কাতার কোনো একদিকে বেশি হয়ে গেলে মাকরূহ হবে। সর্বশেষ অসম্পন্ন কাতারেও উভয় পার্শ্বে সমান মুসল্লী থাকতে চেষ্টা করবে। (আবূ দাউদ, হাদীস নং ৬৮১)

২. অধিকাংশ স্থানে মসজিদের ঠিক মাঝে মেহরাব তৈরি করে তার ডান পার্শ্বে মিম্বর তৈরি করে। এতে ইমাম বাম দিকে চেপে দাঁড়াতে বাধ্য হন। এটা মাকরূহ। সুতরাং মেহরাব তৈরি করার সময় এ ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখবে মেহরাব যদি বড় আকারের হয় তাহলে তার ডান পার্শ্বে মিম্বর বানানো সত্ত্বেও ইমামের মাঝে দাঁড়াতে সমস্যা হয় না। কিন্তু মেহরাব যদি ছোট আকারের হয় এবং মেহরাবের ভেতরে ডান দিকে মিম্বর বানাতে চায় তাহলে মেহরাবকে মসজিদের একদম মাঝে না বানিয়ে একটু ডান দিকে নির্মাণ করা উচিত। তাহলে ইমামের কাতারের একদম মাঝে দাঁড়াতে সমস্যা হয় না। (আবূ দাউদ, হাদীস নং ৬৮১)

মিম্বরের মাসায়েল

১. অনেকে মনে করে মিম্বরে তথা খুতবার সময় ইমামের বসার ও দাঁড়ানোর স্থান কাতারের ঠিক মাঝ বরাবর হওয়া জরুরি। এটা ভুল ধারণা। এর পক্ষে কোনো দলিল নেই। (রদ্দুল মুহতার : ১/৬৪৬)

২. মসজিদের মিম্বর তিন ধাপবিশিষ্ট হওয়া উত্তম এবং প্রতিটি ধাপ এতটুকু উঁচু করবে, যাতে খতীব সাহেব সেখানে আরামের সাথে বসতে পারেন। তিনের অধিক ধাপবিশিষ্ট মিম্বর বানানোরও অনুমতি আছে। রাসূল (সা.) এর মিম্বার তিন ধাপবিশিষ্ট ছিল। (ফাতহুল বারী-২/৪৯০, বাযলুল মাজহূদ-২/১৭৮, ইমদাদুল আহকাম-৩.১৯৫, মাহমূদিয়া-১০/১৯১)

মসজিদে সংরক্ষিত কোরআনে মাজীদের হেফাজত করা আবশ্যক

মসজিদের তাকের মধ্যে কোরআন শরীফ হেফাজতের কোনো ব্যবস্থা করা হয় না। অথচ তা অত্যন্ত জরুরি। সুতরাং কমিটি বা মোতাওয়াল্লীর দায়িত্ব হলো, সকল কোরআন মাজীদ গিলাফে রাখার ব্যবস্থা করা এবং কিছুদিন পর পর গিলাফ পাক সাফ করার ব্যবস্থা করা এবং ছিঁড়া-ফাটা কোরআন শরীফের কপি, যা ঠিক করে পড়ার যোগ্য করা যাবে না সেগুলো পাক কাপড়ে মুড়িয়ে গোরস্তানের কিনারায় দাফন করে দেওয়া এবং হেফাজতের জন্য ব্যবস্থা করা। (আলমগীরী-৫/৩২৩)

উল্লেখ্য, তাকের মধ্যে কোরআন মাজীদ সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবে। কোনো কোরআন উপুড় করে রাখবে না। দুই কোরআনের মাঝে রেহাল রাখবে না। কোরআনের ওপর তাফসীরের কিতাব রাখবে না বা খুতবা ও অন্যান্য কিতাব রাখবে না। মিম্বরের ওপর রেহাল ছাড়া সরাসরি কিতাব ও কোরআন রাখবে না। কোরআন তেলাওয়াতের সময় বা বন্ধ করার সময় কোরআনের ওপর চশমা, কলম, চিরুনি ইত্যাদি রাখবে না। এসবই কোরআনের সাথে বেয়াদবী। (সূরায়ে হজ্জ-৩২, সূরা আবাসা : ১৪, আলমগীরী : ৫/৩২৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/৬২২)

মসজিদকে কেরোসিন বা দুর্গন্ধমুক্ত রাখা উচিত

মেহরাব বা মিম্বরে অনেকে হারিকেন রেখে থাকে বা কেরোসিন তেলের অন্য কোনো বাতি রাখে–এটা উচিত নয়। কারণ কেরোসিন একটি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু, যা মসজিদে দাখিল

করা ঠিক নয়। সুতরাং সেখানে মোমবাতির ব্যবস্থা রাখবে। একান্ত অপরাগতায় মসজিদের বাইরে দুই পাশে হারিকেন রাখতে পারে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-১৮০৬, ইমদাদুল আহকাম-৩/১৮১)

মিনারার মাসআলা

মসজিদের মিনারা থাকা উপকারী জিনিস। এর দ্বারা আযানের আওয়াজ অনেক দূরে পৌঁছানো যায়। তা ছাড়া মুসাফিরদের জন্য মসজিদের সন্ধান পাওয়াও আসান হয়। তবে এর জন্য ভিন্ন ফান্ড কালেকশন করা উচিত। মসজিদের নিজস্ব ফান্ড দিয়ে মিনারা তৈরি করবে না। মসজিদের মধ্যে কোনো প্রকার কারুকার্যও করবে না। মসজিদের মধ্যে কারুকার্য ও জাঁকজমক করা কেয়ামতের আলামত এবং ইয়াহুদীদের সাদৃশ্যতা। (আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৪৮, ফাতহুল কদীর-১/৩৬৮, আলমগীরী-২/৪৬২)

নামাযে মাইক ব্যবহারের মাসায়েল

১. আজকাল বিভিন্ন মসজিদে নামাযে মাইক ব্যবহার করা একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়ে গেছে। দেখা যায়, মসজিদে মাত্র এক বা দেড় কাতার মুসল্লী, যেখানে আসানীর সাথে ইমামের আওয়াজ পৌঁছে যায় এবং মুকাব্বিরের আওয়াজে সুন্দরভাবে রুকু-সেজদা করা যায়। তবুও প্রত্যেক ওয়াক্তে মাইক চালানো হচ্ছে। অথচ এর কোনো প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে মাইকে নামায পড়া হলে মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিকট আওয়াজ নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, যা মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীক্বায় সাদাসিধাভাবে পড়াই উত্তম।

মাইকের এ ফ্যাশনের কারণে প্রায় এসব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এ জন্য এ ধরনের ছোট জামা'আতে মাইক ব্যবহার না করাই উত্তম। হ্যাঁ, যদি অনেক বড় মসজিদ হয় বা কয়েক তলায় জামা'আত হয় সেখানে সতর্কতার সাথে মাইক ব্যবহারে অসুবিধা নেই। অনেক সময় খতীব সাহেব জুমু'আর খুতবা দিতে থাকেন, মুয়াজ্জিন বা খাদেম সাহেব খুতবা চলাকালীন মাইক ঠিক করতে থাকেন। এটা নিষেধ। (রদ্দুল মুহতার : ১/৫৮৯, ২/১৫৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া-১/৮৪৫, রহীমিয়া-১/৯০-৯৪)

২. মসজিদের মাইক দ্বারা আযান-ইকামত, বয়ান, তাফসীর ইত্যাদির কাজ নেবে। মসজিদের মাইকে মৃত ব্যক্তির খবর প্রচার এবং আরো বিভিন্ন দুনিয়াবী কাজে এ'লান করা হয়, এগুলো ঠিক নয়। সকলকে বুঝিয়ে এগুলো বন্ধ করা উচিত। অথবা মসজিদের টাকা দিয়ে মাইক খরিদ না করে ব্যাপক উদ্দেশ্যের কথা বলে ফান্ড সংগ্রহ করে তা দিয়ে মাইক খরিদ করবে। তখন দুনিয়াবী বিশেষ প্রয়োজনেও ওই মাইক ব্যবহার করতে পারবে। (হিন্দিয়া-২/৪৫৯, আহসানুল ফাতাওয়া-৬/৪৪৬, রহীমিয়া-৬/১০৬)

৩. মসজিদের মাইক দ্বারা অনেক স্থানে শেষ রাত্রে যিকির করা হয় বা গজল পড়া হয় বা তেলাওয়াত করা হয়। এ সবই নাজায়েয। কারণ এতে লোকদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে এবং ইবাদাতকারীদের সমস্যা সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া অনেক স্থানে এশার পর গভীর রাত পর্যন্ত মাইকে গজল, কেরাত পড়া হয়। এটাও নিষেধ। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬০১৮, যিকর ও ফিকর-২৫, মাহমূদিয়া-১৮/১৩৩)

আযান-ইকামতের মাসায়েল

১. বর্তমানে অধিকাংশ মসজিদে আযান- ইকামত সুন্নাতের বরখেলাপ দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং মুয়াজ্জিন নিয়োগ দেওয়ার সময় কোনো হক্কানী আলেম দ্বারা পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ দেবে। আর যদি পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত মুয়াজ্জিন হয় তাহলে যেসব প্রতিষ্ঠানে সুন্নাত-তরীক্বায় আযান-ইকামতের মশক করানো হয় সেখানে পাঠিয়ে সুন্নাত-তরীক্বায় আযান-ইকামতের মশক করিয়ে নেবে। এটা কমিটির একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৭৭)

২. মসজিদের কোনো মালসামানা বাইরের দ্বীনি কাজেও ব্যবহার করবে না। এমনকি ঈদগাহের কাজের জন্যও মসজিদের বিছানা ইত্যাদি ব্যবহার করবে না। ঈদগাহের জন্য আলাদা সামানার ব্যবস্থা করবে। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৯, রহীমিয়া-৩/১৬৩, আহসানুল ফাতাওয়া-৬/৪০৭)

মসজিদের ফান্ড থেকে রমাজানের হাফেজ সাহেবদের বিনিময় প্রদান নাজায়েজ

মসজিদ ফান্ড থেকে রমাজান মাসে

হাফেজ সাহেবদের তারাবীর বিনিময় দেবে না। সূরা তারাবী হোক বা খতম তারাবী হোক। কারণ তারাবী বিনিময় লেনদেন উভয়টাই নাজায়েজ। আর নাজায়েজ কাজে মসজিদ ফান্ডের টাকা খরচ করার তো প্রশ্নই আসে না। (আহসানুল ফাতাওয়া-৩/৫১৪, ইমদাদুল মুফতীন-৩১৫, মাহমূদিয়া-৮/২৪৭, ১৮/১৮০)

মসজিদের টাকা নিজের ব্যবসায় খাটানো

অনেক মসজিদের মোতওয়াল্লী মসজিদের টাকা নিজের ব্যবসায় লাগিয়ে থাকে। এটা জায়েজ নেই। বরং এটা মারাত্মক খেয়ানত। এ কাজ করলে সে মোতওয়াল্লীর যোগ্য থাকবে না। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৮০, আহকামে মাসজিদ-২৪৯)

মসজিদকে সুগন্ধ রাখা

হাদীসে এসেছে মসজিদকে সুগন্ধময় ও খোশবুদার করতে হবে। বিশেষ করে জুমু'আর দিন অবশ্যই আগরবাতী, লোবান ইত্যাদির মাধ্যমে মসজিদ খোশবুদার করা নবীজি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত। কিন্তু বর্তমানে বলতে গেলে এ সুন্নাতটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সতরাং এ সুন্নাতটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। এবং জুমু'আর দিন মসজিদকে বিশেষভাবে খোশবুদার করা কর্তব্য। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৫৯৪, মিরকাত-২/৩৯৩)

মসজিদেও অপচয় নাজায়েয

মসজিদে বিছানা বিছানো এবং বাতি দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু প্রয়োজনমাফিক বাতি লাগাবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত বাতি লাগানো ও জ্বালানো অপচয় ও নাজায়েজ। অধুনা অনেক মসজিদে শবে বরাত, শবে কদর ইত্যাদিতে আলোকসজ্জা করা হয়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বাতি লাগানো হয়। এটা অপচয় ও অগ্নিপূজকদের সাথে সাদৃশ্যতার কারণে নাজায়েজ। (সূরা বনী ইসরাইল-২৬-২৭, মুসনাদে আহমাদ-৩/১৩৬)

মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা আবশ্যক

বর্তমানে মসজিদের মধ্যে যেভাবে ইফতারের আয়োজন করা হয় তাতে (অনেক লোকের আয়োজনে হৈ-হল্লা এবং মসজিদে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী পড়ে থাকার দরুণ) মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়। এটা বর্জনীয়। তবে শুধু খেজুর এবং পানি দ্বারা ইফতার করাতে অসুবিধা নেই। (রদ্দুল মুহতার-২/৪৪৯, আহসানুল ফাতওয়া-৬/৪৫৭)

মসজিদ পুনর্নির্মাণের বিধান

কোনো মসজিদ জীর্ণশীর্ণ বা সংকীর্ণ হয়ে গেলে তা ভেঙে ফেলে নতুনভাবে তৈরি করা জায়েজ। পুরনো সামানপত্র বিক্রি করে মসজিদের কাজে লাগিয়ে দেবে। খরিদকারী উক্ত সামান বৈধ ও পবিত্র স্থানে ব্যবহার করবে। মসজিদকে সুন্দর করার জন্য বা সাজানোর জন্য মজবুত মসজিদ ভেঙে ফেলা নাজায়েজ। আজকাল অনেকেই মসজিদ নিয়ে গর্ব ও বড়াই করার লক্ষ্যে পুরনো মসজিদকে মজবুত থাকা সত্ত্বেও শহীদ করে এ ধরনের নাজায়েজ কাজ করে থাকে। (আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৪৮-৪৪৯, মুসনাদে আহমাদ-৩/১৩৬, ফাতাওয়াওয়া রহীমিয়া : ৯/১৪৮)

মসজিদের পজিশন বিক্রি করা এবং মসজিদের জমি দীর্ঘমেয়াদে ভাড়া দেওয়া জায়েজ নেই

মসজিদের দোকানপাটের পজিশন বিক্রি করা জায়েজ নেই। মসজিদ ছাড়াও পজিশন বেচাকেনা শরীয়তে পছন্দনীয় নয়। তা ছাড়া মসজিদের দোকানপাট দীর্ঘ মেয়াদি ভাড়াও দেবে না। এতেও এক ধরনের মালিকানাভাব সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, যা মসজিদের সম্পত্তিতে নিষেধ। হ্যাঁ! এক বছরের জন্য ভাড়া দেবে। এবং প্রতিবছর ভাড়া চুক্তি নবায়ন করে নেবে। আর মসজিদের দোকানপাট ভাড়া দেওয়ার সময় বিশেষ করে খেয়াল রাখবে কোনো অবৈধ কাজের দোকান যেমন : টিভি, ভিডিও ইত্যাদি গান-বাজনার সামগ্রীর জন্য যেন না হয়। কারণ এসবই নাজায়েজ। আর এ ধরনের কাজে দোকান ভাড়া দেওয়া গোনাহের কাজে সহায়তারই শামিল। (সূরায়ে মায়েদা: ২, রদ্দুল মহতার-৪/৪০০, বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়া-১/১০৮)

মসজিদের জায়গা অন্য কাজে খাটানো

১. একবার মসজিদ নির্মাণ করার পর সে স্থানে বা তার কোনো অংশে দোকানপাট, মার্কেট এবং ওজুখানা করা নাজায়েজ। কারণ সেটা কেয়ামত পর্যন্ত মসজিদ থাকে। এটাকে মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো

কাজে ব্যবহার বা পরিবর্তন করা নাজায়েজ ও হারাম। তা ছাড়া মসজিদের কোনো অংশ নিজ অবস্থায় রেখেও কখনো ভাড়ায় দেওয়া যেমন– মূল মসজিদ ভবনের দেয়ালে বা ছাদে বিলবোর্ড, টাওয়ার ইত্যাদি বসাতে দেওয়া জায়েজ হবে না। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৭-৩৫৮)

২. বর্তমানে অনেক স্থানে দেখা যায় যে, নিচতলায় বহুদিন যাবত নামায ও জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার ঘোষণাও ছিল না যে, "এখানে অস্থায়ীভাবে নামায পড়া হচ্ছে, পরবর্তীতে দোতলা থেকে স্থায়ী মসজিদ আরম্ভ হবে।" এমতাবস্থায় উক্ত প্রথম তলা বন্ধ করে দিয়ে সেখানে মার্কেট, দোকানপাট বানানো হচ্ছে। যদিও উক্ত আয় মসজিদের জন্য ব্যয় করা হবে, তথাপি মসজিদকে পরির্বতন করে ফেলার দরুন এটা কবীরাহ গোনাহ। এটা কোনোভাবেই জায়েজ হবে না। কোনো মসজিদ কর্তৃপক্ষ এরূপ করে থাকলে তারা যদি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায় তাহলে তাদের জন্য একটাই রাস্তা খোলা আছে সেটা হলো–ওই মার্কেট, দোকানপাট ভেঙে মসজিদকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে এবং আল্লাহর দরবারে ভালোভাবে তাওবা ইস্তেগফার করে নেবে। তবে যেখানে পূর্বেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে, "প্রথম তলায় অস্থায়ীভাবে নামায ও জামা'আত করা হবে।" সেখানে পরবর্তীতে নিচতলায় দোকানপাট ইত্যাদি করতে অসুবিধা নেই। তবে বৈধ মালের দোকানপাট হতে হবে এবং মসজিদের পবিত্রতার দিকে খুব খেয়াল করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৮, আযীযুল ফাতাওয়া-২২৮)

উল্লেখ্য, মূল মসজিদের নিচে বা ওপরে কখনো কোনো প্রকার টয়লেট, ওজুখানা বা ফ্যামিলি কোয়ার্টার তৈরি করা যাবে না। (রদ্দুল মুহতার-১/৬৫৬, ৪/৩৫৮)

মসজিদে ঘুমানো বা রাত্রিযাপন

মুসাফির এবং ই'তিকাফরত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ রাতের এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি সময় মসজিদে অবস্থান করতে পারবে না। এবং মসজিদের কোনো সামান যেমন লাইট, ফ্যান ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে না। অবশ্য ই'তিকাফের মধ্যে নফল ই'তিকাফও শামিল, কাজেই দ্বীনি দাওয়াত ও তা'লীমের জন্য সাময়িক থাকতে হলে নফল ই'তিকাফের নিয়্যতে থাকার প্রয়োজনেও মসজিদের আসবাব ব্যবহারের অবকাশ আছে। (আলমগীরী-২/৪৫৯)

মহিলাদের মসজিদে গমন নাজায়েয

বর্তমানে কোনো কোনো সাধারণ মসজিদে মহিলাদের নামায পড়ার যে আলাদা ব্যবস্থা করা হচ্ছে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ নয়। আবূ হুমাইদ আস্ সা'ইদী (রাযি.)-এর স্ত্রী উম্মে হুমাইদ একবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে জামা'আতে নামায পড়তে আমার ভালো লাগে। এ কথা শুনে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তা আমি জানি। তবে শোন, তোমার জন্য তোমার ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আবার বারান্দার কামরায় নামায পড়া তোমার জন্য তোমার ঘরের আঙিনায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর তোমার ঘরের আঙিনায় নামায তোমার জন্য তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। একইভাবে তোমার মহল্লার মসজিদে নামায তোমার জন্য আমার মসজিদে আমার সাথে নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন : এ কথা শোনার পর তিনি পরিবারের লোকদের ঘরের ভেতরে নামাযের স্থান বানাতে বলেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তা বানানো হয়। এরপর তিনি আমৃত্যু সেখানেই নামায পড়তে থাকেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-২২১৭)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর মহিলাদের মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন এসেছে, সেটা যদি তিনি দেখতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন। যেভাবে নিষেধ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৮৬৯)

এ ধরনের আরো বহু হাদীস, যেগুলো মহিলাদের মসজিদে গমনকে নিষেধ করে সে সমস্ত হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ফুক্বাহায়ে কেরাম মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়াকে নাজায়েয সাব্যস্ত

করেছেন। এ জন্য বর্তমানে যে সকল মহিলা মসজিদে গিয়ে নামায পড়ছে। তারা নাজায়েজ কাজ করছে। তাদের এ কাজ পরিহার করা কর্তব্য।

অবশ্য টার্মিনাল, জংশন, স্টেশন তথা ভ্রমণ পথের এ-জাতীয় স্থানে মসজিদের পার্শ্বে মুসাফির মহিলাদের ওজু ও নামাযের পর্দার ব্যবস্থাসম্বলিত জায়গা রাখা বাঞ্ছনীয়। যেখানে তারা ইস্তিঞ্জা-ওজু সেরে একাকী নামায পড়ে নিতে পারে।

বি.দ্র. এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ই'লাউস সুনান-৪/২৬০ ইবনে খুযাইমা হা : নং ১৬৮৩, মুসনাদে আহমাদ : ৬/২৯৭, তাবারানী কাবীর, ২৫/১৪৮, মাযমাউয যাওয়ায়েদ : ২/১১৮

মসজিদের ভেতরে জুতা নেওয়া

১. মসজিদে জুতা নেওয়ার মাসআলা হলো : মসজিদের গেটে জুতার ধুলাবালি ঝেড়ে কাপড়ের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলবে। তারপর কাতারে দুই পায়ের মাঝে রেখে দেবে। এটাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৫৪)

২. আজকাল সিজদার জায়গার সামনে জুতা রাখা হয়। সিজদায় গেলে অনেক ক্ষেত্রে জুতা মাথায় লাগে। তা ছাড়া জুতার বাক্সে কোনো ঢাকনা না থাকায় জুতা যে মুসল্লীদেরকে এস্তেকবাল করে এ তরীক্বা পছন্দনীয় নয়। সুতরাং জুতা বাক্সে রাখতে হলে বাক্সের ঢাকনা থাকা উচিত। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৫৫-৪৫৬)

মসজিদে কোনো মুসল্লীর স্থান নির্ধারিত নেই

মসজিদে একমাত্র ইমামের স্থান নির্ধারিত। মুয়াজ্জিন বা অন্য কারো স্থান নির্ধারিত নয়। মুয়াজ্জিন যেকোনো কাতারে দাঁড়িয়ে ইকামত দিতে পারেন। কাজেই মুয়াজ্জিন বা মসজিদের অন্য কোনো কর্মকর্তা বা মুসল্লীর জন্য সর্বক্ষণ জায়নামায বিছিয়ে মসজিদে সিট দখল করে রাখা শরীয়তবিরোধী কাজ। সুতরাং যে প্রথমে আসবে সেই প্রথম কাতারে ইমামের পেছনে বসতে পারবে। এ ক্ষেত্র আমির-ফকিরের কোনো পার্থক্য নেই। তবে সম্ভব হলে ইমামের সরাসরি পেছনে প্রথম কাতারে আলেম-উলামাদের দাঁড়ানো উচিত বা তাঁদের জন্য সুযোগ করে দেওয়া ভালো। যাতে ইমামের ভুলভ্রান্তি হলে তাঁরা কাছ থেকে সংশোধন করে সকলের নামাযের হেফাজত করতে পারেন কিংবা ইমামের কোনো সমস্যা হয়ে গেলে তিনি নিজে সরে গিয়ে তাঁদের একজনকে নিজের স্থানে দাঁড় করিয়ে ইমামতির কাজ দিতে পারেন। (মুসলিম হা : নং ১২২, তিরমিযী হা : ২২৮, রদ্দুল মুহতার-১/৬৬২, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া : ১০/৫৩)

নিচতলা খালি রেখে দোতলায় জামা'আত

কোনো জায়গায় দেখা যায় যে বিনা উযরে দোতলা মসজিদের প্রথম তলা বাদ রেখে দ্বিতীয় তলায় জামা'আত করে থাকে। এটা উচিত নয়। বরং ইমাম সাহেব নিচতলায় দাঁড়াবেন। এবং মুসল্লীগণও নিচতলায় দাঁড়াবেন। অর্থাৎ, জামা'আত নিচতলায় অনুষ্ঠিত হবে। তবে নিচতলায় যাদের জায়গা হবে না তারা দ্বিতীয় তলায় জামা'আতে শরীক হবেন। (রহীমিয়া-৯/২১৮)

কাতারের মাসায়েল

১. নামাযের কাতার তিন হাত বা কমপক্ষে পৌনে তিন হাত চওড়া করবে। যাতে সুন্নাত-তরীক্বা মোতাবেক সিজদা করা সম্ভব হয়। অনেক মসজিদে দুই বা আড়াই হাত চওড়া কাতার করা হয়, যার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সিজদা করা সম্ভব হয় না। মাথা সামনের মুসল্লীর পায়ে আটকে যায়। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪৯৬, আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৯৮)

২. কাতারের দাগের ওপর পায়ের গোড়ালি রেখে কাতার সোজা করবে। এটাই সহীহ তরীক্বা। অনেক স্থানে দাগে আঙুল রেখে কাতার সোজা করা হয়, এতে কাতার কখনো সোজা হয় না। বরং যার পা লম্বা সে পেছনে থাকে, আর যার পা খাটো সে সামনে চলে যায়। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৬৭, রদ্দুল মুহতার : ১/৫৬৭)

৩. কাতার মাঝখানে থেকে শুরু হয়ে সমানভাবে ডানে-বাঁয়ে বাড়াতে থাকবে। এটাই নিয়ম। অনেকে বাতাসের লোভে এ নিয়ম ভঙ্গ করে সামনের কাতার খালি থাকা সত্ত্বেও পেছনে পাখার নিচে দাঁড়ায়। কাতার হিসেবে তার কোথায় দাঁড়ানো উচিত এর কোনো পরোয়া করে না। এটা সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। কোনো কোনো মাযহাবে এ সমস্ত ভুলের কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো লোক এমনও দেখা যায় যে, মসজিদে অনেক আগে এসে সামনে খালি পাওয়া সত্ত্বেও পেছনে বসে থাকে। তাদের এ কাজের হিকমত বোধগম্য নয়। আবার কেউ সবার শেষে এসে সামনে খালি না

থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাঁধ টপকে সামনে যায়। তারপর জায়গা না পেয়ে দুজনের ঘাড়ে সাওয়ার হয়। এটা খুবই গর্হিত কাজ। হাদীসে এসেছে যে এরূপ করল সে যেন জাহান্নামে যাওয়ার জন্য একটি পুল তৈরি করল। (মুসলিম শরীফ : হাদীস নং ৪৩০, আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৭১, তিরমিযী, হাদীস নং ৫১২)

জুমু'আর প্রথম আযানের পর দুনিয়াবী কাজ করা নিষেধ

জুমু'আর প্রথম আযানের সাথে সাথে মসজিদে রওনা হওয়া বা রওনার প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি। প্রথম আযানের পর বেচাকেনা ও দুনিয়াবী অন্যান্য কাজ এমনকি ঘরে বসে নফল নামায বা কোরআন তেলাওয়াত সবই নিষেধ হয়ে যায়। (সূরায়ে জুমু'আ-৯)

খুতবা চলাকালীন সময়ে দানবাক্স চালানো

আমাদের দেশে অনেক মসজিদে খুতবা চলাকালীন দানবাক্স চালানো হয়। এটা মারাত্মক ভুল। এতে গোনাহ তো হয়ই, উপরন্তু জুমু'আর ফযীলতও বাতিল হয়ে যায়। (সূরায়ে আ'রাফ-২০৪, মুসলিম শরীফ, হা : নং ৮৫১)

কাজেই কাবলাল জুমু'আ সুন্নাতের পরে বা ফরয নামাযের সালামের পরে মসজিদের জন্য কালেকশন করবে। এর উত্তম তরীক্বা হলো প্রত্যেক কাতারে একজন রুমাল নিয়ে চলতে থাকবে। সকলে রুমালের মধ্যে হাত ঢুকাবে। চাই এই মুহূর্তে দান করুক বা না করুক। এতে কারো প্রতি বদগুমানী হবে না এবং আস্তে আস্তে সকলের মধ্যে দানের অভ্যাস গড়ে উঠবে। (রুদ্দুল মুহতার : ২:১৫৯)

মসজিদে জানাযা নামায পড়ার বিধান

বিনা অপরাগতায় মসজিদে জানাযা নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী ও নাজায়েয। যদিও লাশ মসজিদের বাইরে রাখা হয়। এর দ্বারা জানাযা নামাযের যে উহুদ পাহাড় পরিমাণ সাওয়াবের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তাও বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং যেসব এলাকায় কোনো মাঠ বা খালি স্থান আছে, সেখানে অবশ্যই মাঠে জানাযা পড়বে। অলসতা করে মসজিদের মধ্যে জানাযা পড়বে না। হ্যাঁ! যেখানে এ ধরনের মাঠ নেই বা প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে ঠেকাবশত মসজিদের মধ্যে জানাযা পড়ার অবকাশ আছে। (আবু দাউদ, হা: নং ৩১৯১, রদ্দুল মুহতার-২/২২৪)

উল্লেখ্য, মসজিদের মাঠে জানাযা পড়ার ক্ষেত্রে সুন্নাত নামায থাকলে তা পড়ে তারপর জানাযার জন্য বের হওয়া উত্তম। কারণ লোকদের অন্তরে সুন্নাতের গুরুত্ব কমে গেছে। তাই কোনো বাহানায় বের হয়ে গেলে আর সুন্নাত পড়া হয় না। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১৮৯, ফাতহুল বারী-২/৯০)

বিনা উযরে মসজিদে ঈদের নামায পড়া ঠিক নয়

বর্তমানে মসজিদের মধ্যে ঈদের নামায পড়ার একটা কুপ্রথা চালু হয়ে গেছে। এটা বন্ধ করা উচিত। কারণ ঈদের নামায মাঠে-ময়দানে ও ঈদগাহে পড়া নবীজির সুন্নাত। মসজিদে পড়া সুন্নাত নয়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবল বৃষ্টির উযরে জীবনে একবার মাত্র মসজিদে ঈদের নামায পড়েছিলেন। এ ছাড়া সব সময় তিনি ঈদের নামায ময়দানে পড়েছেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আশেকদের জন্য এসব সুন্নাতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া খুবই প্রয়োজন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৯৫৬, আবু দাউদ, হাদীস নং ১১৬০)

মসজিদে তা'লীম

ইমাম সাহেব মসজিদের মধ্যে প্রতিদিন রুটিনমাফিক অন্তত তিন প্রকার তা'লীম দেবেন।

ক. ঈমান ও বিশ্বাসের তা'লীম এবং ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের তা'লীম। এ বিষয়টি শরীয়তে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর চেয়ে জরুরি কোনো বিষয় শরীয়তে নেই। (বুখারী, হা : নং ৯, মুসলিম, হা : নং ১, আবু দাউদ, হা : নং ৪৬৯৫)

খ. কোরআনে কারীম ও দু'আ-কালাম, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ ইত্যাদি সহীহ করার তা'লীম। (দারা কুতনী, হা : নং ৪৫, দারেমী, হা : নং ২২১)

গ. দ্বীনের জরুরি মাসায়েল এবং ওজু, নামায, আযান, ইকামতের বাস্তব প্রশিক্ষণ, যা একান্ত জরুরি। কারণ প্রশিক্ষণ ব্যতীত শুধু বয়ান শোনার দ্বারা নামায সহীহ করা সম্ভব নয়। (বুখারী শরীফ, হা : নং ৬৭৭, নাসায়ী, হা : নং ২২৭৭, আবু দাউদ, হা : নং ৫৩০)

এ ছাড়া সপ্তাহে এক দিন কিংবা আধাঘণ্টার জন্য মুসল্লীদেরকে ধারাবাহিকভাবে কোরআনের তাফসীর করে শোনাবেন। জুমু'আর

বয়ানটি পরিকল্পিতভাবে করবেন। যাতে সকল মুসল্লীর মধ্যে ফরজে আইন পরিমাণ ইলম এসে যায়। যথা : ঈমান-আকীদা ঠিক করা, ইবাদত-বন্দেগী সুন্নাত ও মাসআলা অনুযায়ী করা, রিযিক হালাল রাখা, বান্দার হক আদায় করা এবং আত্মশুদ্ধি করা। তা ছাড়া ইমাম সাহেব মুসল্লীদের নিয়ে নিজের মহল্লায় এবং পার্শ্ববর্তী মহল্লায় গাশতের নেযাম চালু করবেন এবং মহল্লার দুস্থ মানবতার খেদমতের জন্য ধনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এই হলো ইমাম সাহেবদের দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এসব দায়িত্ব পালন করলে মসজিদগুলো হেদায়াতের মারকাযে পরিণত হবে ইনশা আল্লাহ। (সূরায়ে আলে ইমরান-১৬৪, আবু দাউদ- হাদীস নং ৩৬৪১)

মসজিদ পরিচালনা পরিষদের রূপরেখা

বর্তমানে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে দেশ পরিচালনা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু পরিচালনা করা হচ্ছে। অথচ কোরআনে কারীমের বহু আয়াতে গণতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। যার কিছু লেখকের "কিতাবুল ঈমান"-এর পঞ্চম অধ্যায় থেকে জানা যাবে।

পরিচালনার এ পদ্ধতি সর্ব নিকৃষ্ট পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মানুষের খুলি গণনা করা হয়। কিন্তু মগজ মাপা হয় না। এ পদ্ধতিতে একজন বিচারপতির রায়ের যে মূল্য একজন বেকুফের রায়ের একই মূল্য। এ পদ্ধতিতে কখনো কোনো জিনিস ভালোভাবে চলতে পারে না। এ জন্য মসজিদ পরিচালনার ব্যাপারে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

মহল্লার মধ্যে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ, পাক্কা নামাযী, পরহেযগার ও জ্ঞানী লোক থাকবেন ইমাম সাহেবসহ তাঁদেরকে মজলিসে শুরা ঘোষণা করবেন। অতঃপর তাঁদের পরামর্শে ও মনোনয়নে মাঝ বয়সী পরহেযগার নামাযী ও জ্ঞানী লোকদেরকে কমিটির সদস্য বা মোতওয়াল্লীর সাহায্যকারী বানানো হবে। তাঁরা মূলত মসজিদের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাবেন আর মজলিসে শুরা শুধু তাঁদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করতে থাকবেন। কমিটির কোনো ভুলভ্রান্তি হলে তাঁরা শুধরে দেবেন। কমিটির সদস্যদের মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি হলে তাঁরা মীমাংসা করে দেবেন। এবং তাঁদেরকে সুপরামর্শ দিতে থাকবেন। কোনো সদস্য মসজিদের জন্য সময় না দিলে বা কাজে অনীহা প্রকাশ করলে তাঁকে সংশোধন করবেন। যদি তিনি অপরাগতা পেশ করেন তাহলে তাঁর স্থলে নতুন সদস্য মনোনীত করবেন। সারকথা : ইসলাম জ্ঞানীদের মনোনয়ন ও পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। আমজনগণের নির্বাচন বা তাদের ভোটাভুটির সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করে না। (সূরায়ে নিসা : ৫৯, আন'আম-১১৬,বিদায়া নিহায়া-৭/১৪০)

বিনিময় নিয়ে মসজিদে বাচ্চাদের তা'লীম দেওয়া

বিনিময় নিয়ে মসজিদের মধ্যে বাচ্চাদের বা অন্যদের তা'লীম দেওয়া মাকরূহ ও নাজায়েয। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করা হচ্ছে। এ জন্য ইমাম-মুয়াজ্জিন বা খাদিমগণ মসজিদের তা'লীম আল্লাহর ওয়াস্তে দেবেন। অন্যদিকে মসজিদ কমিটি তাঁদের জন্য সম্মানজনক বেতনের ব্যবস্থা করবে। যাতে তাঁরা এ নাজায়েয বেতনের মুখাপেক্ষী না থাকেন। এতে আলেমদের মর্যাদাহানি হয়। এ থেকে পরহেয করা কর্তব্য। (মুসলিম শরীফ-হাদীস নং ২৮৫, দূরের মুখতার ও রদ্দুল মুহতার-৫/৩৬৪, আলমগীরী-৫/৩২১)

মসজিদকে স্থায়ীভাবে মাদরাসা বানিয়ে নেওয়া

মসজিদের ভেতরে বা মসজিদের ওপরের তলায় আবাসিক মাদরাসা কায়েম করা জায়েজ নেই। এতে মসজিদের সম্মান ও ইহতেরাম রক্ষা পায় না। বর্তমানে কিছু কিছু স্থানে দেখা যাচ্ছে যে মসজিদ কমিটি দ্বীনের খেদমত মনে করে মসজিদের মধ্যে এ ধরনের মাদরাসা কায়েম করেছেন, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ। হ্যাঁ! অনাবাসিকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মসজিদের যেকোনো তলায় দ্বীনের তা'লীম-তারবিয়ত জায়েয আছে। তবে যিনি পড়াবেন তিনি বিনা বেতনে পড়াবেন এবং এ তা'লীমের দ্বারা মুসল্লীদের ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি। (রদ্দুল মুহতার-১/৬৬০-৬৬৩, আলমগীরী-৫/৩২১)

জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আও আদায় করতে হবে

মুফতী মুহাম্মাদ শফী কাসেমী

একই দিন জুমু'আ ও ঈদ হলে উভয়টি আদায় করা শরীয়তের নির্দেশ। সাম্প্রতিককালে কিছু ভাইদের বলতে শোনা যাচ্ছে, 'জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আর নামায পড়তে হবে না।'

এখানে এ বিষয়ে পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ ও ইজমা-কিয়াস থেকে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পাব, ইনশা আল্লাহ।

পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীসে যেসব স্থানে জুমু'আ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেসব স্থানে প্রতি শুক্রবার জুমু'আর জামা'আতে শরীক হওয়াকে আবশ্যকীয় করা হয়েছে। ঈদের দিনকে আলাদা করা হয়নি।

পবিত্র কোরআন থেকে

১। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

'হে মুমিনগণ, যখন জুমু'আর দিনে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচাকেনা বর্জন করো। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।' (সূরা ৬২ জুমু'আ, আয়াত-৯)

উপরোল্লিখিত আয়াতে বেচাকেনা ছেড়ে জুমু'আর নামাযের জন্য প্রত্যেক
জুমু'আর দিনেই উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঈদের দিনকে বাদ দেওয়া হয়নি।

২। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

'সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করো এবং ফজরের সময় কোরআন পাঠে যত্নবান থাকো। স্মরণ রেখো! ফজরের তেলাওয়াতের সময় ঘটে থাকে (ফেরেশতাদের) সমাবেশ।' (সূরা ১৭ ইসরা, আয়াত-৭৮)

উক্ত আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরজ করা হয়েছে। ঈদের দিন জুমু'আর নামায পড়া না হলে সেদিন এক ওয়াক্ত নামায কমে গিয়ে চার ওয়াক্ত হয়ে যাবে। অতএব, সেদিনও জুমু'আর নামায আদায় করা ফরজ থাকবে।

সহীহ হাদীস থেকে

১। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

'জুমু'আর নামাযে গমন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের ওপর ফরজ। (নাসাঈ শরীফ, হাদীস-১৩৫৪)

উক্ত হাদীস শরীফে প্রত্যেক বালেগ মুসলমানের ওপর জুমু'আর নামায প্রতি জুমু'আর দিন ফরজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ঈদের দিনকে আলাদা করা হয়নি।

অন্যদিকে কোনো রূপ ইছতিসনা (পৃথক) করা ছাড়া যেকোনো শুক্রবার
জুমু'আর নামায তরকের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে
হাদীস শরীফে। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

'লোকেরা জুমু'আ তরক করা হতে বিরত থাকুক। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন। এরপর তারা গাফিলীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।' (মুসলিম শরীফ, হাদীস-১৪৩২)

জুমু'আ ও ঈদ একই দিন হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম কী করতেন

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) জুমু'আর দিন ঈদ হলে সর্বদা ঈদের নামায ও জুমু'আর নামায উভয়টিই আদায় করেছেন। কখনো ঈদের নামায পড়ে জুমু'আর নামায ছেড়ে দেননি। এ সম্পর্কে হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ

'রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই ঈদে ও জুমু'আয় সূরা আলা এবং সূরা গাশিয়াহ পড়তেন। আর যখন ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে হতো, তখনো তিনি ঈদ ও জুমু'আ উভয় নামাযে উক্ত সূরা দুটি পড়তেন।'
(মুসলিম শরীফ, হাদীস-১৪৫২)

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে জানা গেল, জুমু'আর দিন ঈদ হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদ ও জুমু'আ উভয় নামাযই আদায় করেছেন। রাসূল (সা.) কখনো ঈদের নামায পড়ার পর জুমু'আর নামায ছেড়ে দিয়েছেন, এমন কথা কোনো হাদীসে উল্লেখ নেই।

অতএব জুমু'আর দিন ঈদ হলে উভয় নামাযই আদায় করতে হবে। জুমু'আর নামায ঐচ্ছিক হয়ে যাবে না।

দুয়েকটি হাদীসে ঈদের দিন জুমু'আ ঐচ্ছিক হওয়ার যে উল্লেখ রয়েছে, তার

ব্যাখ্যা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে মদীনা শহরের পাশে আট মাইল দূরে উঁচু স্থানে অবস্থিত কিছু অঞ্চল ছিল। সেখানকার অধিবাসীদের ওপর জুমু'আর নামায ফরজ ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) আওয়ালী (উঁচু স্থানে অবস্থিত) এলাকার অধিবাসীদের ঈদের দিনে জুমু'আর নামাযের জন্য উপস্থিত হওয়াটা তাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেন। ঈদের নামায পড়ে ঘোষণা দেন যে আওয়ালী থেকে আগত ব্যক্তিরা ইচ্ছা করলে মদীনায় ঈদের নামায পড়ার পর অবস্থান করে জুমু'আর নামায আদায় করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে ঈদের নামায পড়ে এলাকায় ফিরেও যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যামানায় ঈদ ও জুমু'আ একত্রিত হলো। তখন তিনি বললেন–

من احب ان يجلس من اهل العالية فليجلس من غير حرج

'আওয়ালীর অধিবাসীদের যারা বসে থাকতে ইচ্ছুক, তারা বসে থাকুক। এতে কোনো অসুবিধা নেই। (সুনানে বায়হাকী, ৩/৪৪৪)

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দাদা উস্তাদ কর্তৃক লিখিত কিতাব 'মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক'-এ উল্লেখ আছে–

أن النبى صلى الله عليه وسلم اجتمع فى زمانه يوم جمعة ويوم فطر أو يوم جمعة وأضحى فصلى بالناس العيد الاول ، ثم خطب ، فأذن للانصار فى الرجوع إلى العوالى وترك الجمعة ، فلم يزل الامر على ذلك بعد

'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যামানায় ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহা জুমু'আর দিন অনুষ্ঠিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের নিয়ে ঈদের নামায পড়েছেন। এরপর খুতবাহ দিয়েছেন। তাতে তিনি আওয়ালীর আনসারগণকে জুমু'আ ছেড়ে ফিরে যেতে অনুমতি দিয়েছেন। এরপর এ ব্যাপারটি এভাবেই চলতে থাকে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৩/৩০৪, হাদীস-৫৭২৯)

খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্য হতে কেউ কখনো জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আ ছেড়ে দেননি। জুমু'আয় উপস্থিত না হওয়ার অনুমতির বিষয়টি তারাও আওয়ালী অধিবাসী তথা যাদের ওপর জুমু'আয় উপস্থিত হওয়া জরুরি নয়, তাদের ব্যাপারে খাস মনে করতেন। যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে–

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ

'আবু উবাইদ (রহ.) বলেন, আমি হযরত উসমান (রাযি.)-এর সাথে ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করি। দিনটি ছিল জুমু'আর দিন। তিনি খুতবার পূর্বে ঈদের নামায পড়ালেন। এরপর ঈদের খুতবা দিলেন। তারপর বললেন, হে লোক সকল! আজ এমন একদিন, যাতে তোমাদের জন্য দুটি ঈদ একত্রিত হয়ে গেছে। কাজেই আওয়ালীর অধিবাসীদের মধ্য থেকে (যাদের ওপর জুমু'আ ওয়াজিব নয়) যারা জুমু'আর নামায পড়ে যেতে চায়, তারা যেন অপেক্ষা করে। আর যারা ঘরে ফিরে যেতে চায়, তাদেরকে ফিরে যাবার অনুমতি দিলাম। (বুখারী শরীফ, হাদীস-৫১৪৫)

উল্লেখ্য, আলোচ্য হাদীসে হযরত উসমান (রাযি.) জুমু'আ পড়া ও না পড়ার অনুমতি শুধু আওয়ালীর অধিবাসীদেরকে দিলেন, যাদের ওপর মূলত জুমু'আ ওয়াজিব ছিল না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যাদের ওপর জুমু'আ ওয়াজিব, যারা শহরে বা শহরের মতো গ্রামে বসবাস করে, তাদের জন্য জুমু'আ ছাড়ার কোনো অনুমতি নেই। ঈদের নামাযের পর তাদের জন্য জুমু'আর ওয়াক্ত হলে অবশ্যই জুমু'আর নামায আদায় করতে হবে।

এখানে হযরত উসমান (রাযি.) শহরবাসীদের ওপর এমন বাধ্যবাধকতা তখনই করতে পারতেন, যদি তা প্রিয় নবী (সা.) থেকে প্রমাণিত হতো। সুতরাং এটা মারফু হাদীসের হুকুমে বলে গণ্য হবে।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো হাদীসেই ঈদের দিন জুমু'আ না পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বরং জুমু'আয় উপস্থিত না হওয়ার অনুমতির কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয় যে, এ অনুমতি তাদের জন্য, যারা গ্রামে থাকত, যাদের ওপর জুমু'আ ফরজ ছিল না। (আত-তামহীদ, ১০/২৭৩)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে যাদের ওপর জুমু'আর নামায ফরজ, ঈদের নামায আদায় করার দ্বারা তাদের জুমু'আ হতে কোনোক্রমেই অব্যাহতি মিলবে না। জুমু'আর নামাযও অবশ্যই আদায় করতে হবে। হ্যাঁ, যাদের ওপর জুমু'আ ফরয নয়, তাদের ব্যাপার ভিন্ন।

ইজমা

ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পুরো উম্মত জুমু'আর নামায প্রত্যেক জুমু'আর দিন ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে আসছেন। এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কোনো ইখতিলাফ তথা মতানৈক্য নেই।

আল্লামা হাফেয ইবনে আব্দুল বার (রহ.) বলেন–

ولا يختلف العلماء فى وجوب الجمعة على من كان بالمصر بالغا من الرجال الاحرار الخ

'এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের ইখতিলাফ নেই যে শহরে বসবাসকারী বালেগ আযাদ পুরুষদের ওপর জুমু'আর নামায ফরজ।' (আল-ইসতিযকার, ৭/২৫)

কিয়াস

কিয়াসের তাকাযাও এটাই যে জুমু'আ ও ঈদ একই দিনে হলে ঈদের নামায আদায়ের দ্বারা জুমু'আ ঐচ্ছিক হয়ে যাবে না। কেননা, সুন্নাত বা ওয়াজিব আদায়ের দ্বারা ফরজ আদায় করা রহিত হতে পারে না। (আল-ইসতিযকার, ৭/২৬)

যারা জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আ ওয়াজিব নয় বলে, তাদের কিছু দলিল ও তার জবাব

জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আ ঐচ্ছিক হওয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ জয়ীফ, মুজতারাব ও ব্যাখ্যার উপযুক্ত কিছু বর্ণনা দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন। যেগুলো কোরআন-সুন্নাহ ও ইজমার খেলাফ কখনো দলিল হতে পারে না। এর পরও আমরা সেই দুর্বল দলিলগুলো উল্লেখ করে সেগুলোর জবাবও পেশ করছি।

হযরত ইয়াস ইবনে আবী রমলাহ শামী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি)-কে দেখেছি, তিনি যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে দুই ঈদ (বার্ষিক ঈদ ও জুমু'আর ঈদ) প্রত্যক্ষ করেছেন, যা একই দিন সংঘটিত হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মুআবিয়া (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কিরূপ করেছেন? যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযি.) বললেন–

صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

'রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদের নামায পড়েছেন। এরপর বলেছেন, যে নামায পড়ার ইচ্ছা করে, সে যেন নামায পড়ে।' (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-৯০৪)

হাদীসটির জবাব

এ হাদীস সম্পর্কে ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন, 'এ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইয়াস মাজহুল রাবী।'

প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ আল্লামা ইবনুল কাত্তান (রহ.) বলেন, 'ইয়াস বিন আবি রমলাহ শামী মাজহুল রাবী।' (তাহযীবুত তাহযীব, ১/১৯৬)

এ হাদীসকে অনেকেই মুনকারও বলেছেন। (আল-ইসতিযকার, ৭/২৫)

অতএব, এ ধরনের হাদীস পবিত্র কোরআন ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের বিপরীত দলিল হতে পারে না।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا

'হযরত আতা ইবনে আবী রবাহ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.) সম্পর্কে বলেন, ঈদ ও জুমু'আর দিন একত্রিত হলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.) দিনের শুরুতে আমাদের নিয়ে নামায পড়ালেন। এরপর আমরা জুমু'আর জন্য গেলাম। কিন্তু তিনি আমাদের নিকট এলেন না। তখন আমরা একাকী নামায পড়লাম। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-৯০৫)

হাদীসটির জবাব :

(ক) হাদীসটি মুজতারাব। এর সনদ ও মতন উভয় ক্ষেত্রে ইজতিরাব রয়েছে। (আত তামহীদ, ১০/২৭৪)

(খ) হাফেয ইবনে আবদুল বার (রহ.) এ হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। (আল-ইসতিযকার, ৭/২৫)

(গ) কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযি.) ওই দিন জুমু'আর নামায-ই আদায় করেছেন। ঈদকে জুমু'আর তাবে করে দিয়েছেন। হয়তো তাঁর মাযহাব ছিল জুমুআ ও ঈদের সময় একই। যেমনটি কিছু উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন। (মাআলিমুস সুনান, ১/২৪৬)

(ঘ) আল্লামা মুনযিরী বলেন, হাদীসটি ইবনে মাজাহ শরীফে উল্লেখ আছে। আর তার সূত্র জয়ীফ। কারণ ওই সনদে বাকীয়া ইবনুল ওলীদ নামক আপত্তিকর রাবী রয়েছেন। (আওনুল মাবুদ, ১/৫৪৫)

অতএব, বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের বর্ণনা অনুসারে উক্ত হাদীসটি দলিলযোগ্য নয়। (আল-ইসতিযকার, ৭/২৬)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

'তোমাদের এই দিন দুটি ঈদ (বার্ষিক ঈদ ও সাপ্তাহিক) একত্রিত হয়েছে। যে চায়, সে জুমু'আ না পড়লেও পারবে। আর আমরা অবশ্যই জুমু'আ আদায় করব।' (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-৯০৭, ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস-১৩০১)

হাদীসটির জবাব :

এ হাদীসটি জয়ীফ। এ হাদীস হযরত শু'বাহ (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত। কিন্তু হাফেয ইবনে আবদুল বার (রহ.) বলেন, শু'বাহ (রহ.) থেকে বিশ্বস্ত কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেননি। (আত-তামহীদ, ১০/২৭২)

তাঁর কাছ থেকে এ হাদীসটি বাকীয়্যাহ ইবনে ওলীদ বর্ণনা করেছেন। যিনি একজন আপত্তিকর ও দুর্বল রাবী। (তাহযীবুত তাহযীব, ১/২৩৯-২৪১, আল ইলালুল মুতানাহিয়া, ১/৪৬৯-৪৭০)

এ ছাড়া আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেছেন, এ হাদীসের সনদে আপত্তি আছে। (মা'আলিমুস সুনান, ১/২৪৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করে বলেন,

اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ

'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যামানায় দুই ঈদ একত্রিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। এরপর বললেন, 'যে জুমু'আয় আসতে চায়, সে যেন আসে। আর যে চায়, বাসায় থেকে যাবে, সে থেকে যাক।'
(ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস-১৩০২)

হাদীসটির জবাব :

এ হাদীসটি জয়ীফ। কারণ, এর রাবীদের মধ্যে জাবারাহ ও মিনদাল রয়েছেন। তাঁরা জয়ীফ রাবী। (মিসবাহুয যুজাজাহ, ১/৭৮৯, আল ইলালুল মুতানাহিয়া, ১/৪৭০)

উক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে জুমু'আ ও ঈদ একই দিনে হলে জুমু'আর নামায ঐচ্ছিক হওয়ার ব্যাপারে এমন কোনো হাদীস পাওয়া যায় না, যা নির্ভরযোগ্য হতে পারে। অতএব পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীস এবং ইজমার খেলাফ করে জুমু'আর নামায ত্যাগ করা যাবে না। বরং উভয় নামাযই আদায় করতে হবে।

আল্লামা আবু মুহাম্মাদ ইবনে হাযম (রহ.) বলেন,

اذا اجتمع عيد فى يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد ولا يصح اثر بخلاف ذلك.

'যখন জুমু'আর দিনে ঈদ হবে, তখন ঈদের নামায পড়ে জুমু'আর নামায পড়বে। আর এটা জরুরি বিষয়। এর খেলাফ যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার কোনোটাই সহীহ নয়।'
(আল-মুহাল্লা, ৫/৮৯)

যদি জুমু'আর নামায আদায় করা জরুরি না হওয়ার হাদীসগুলোকে সহীহ মেনেও নেওয়া হয়, তাহলেও হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের বর্ণনা অনুযায়ী জুমু'আর নামায আদায় না করার অনুমতির বিষয়টি আওয়ালী অঞ্চলের বাসিন্দা ও তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে যাদের ওপর জুমু'আ ওয়াজিব নয়।

যেমন– প্রসিদ্ধ হাফেযে হাদীস হযরত ইমাম ত্বহাবী (রহ.) বলেন,

ان المرادين بالرخصة فى ترك الجمعة فى هذين الحديثين هم اهل العوالى الذين منازلهم خارجة عن المدينة ممن ليست الجمعة عليهم واجبة.

'এ হাদীসদ্বয়ে বর্ণিত জুমু'আ না পড়ার ব্যাপারে অবকাশ তাদেরই জন্য প্রযোজ্য, যারা আওয়ালীর অধিবাসী, যাদের আবাসস্থল মদীনার বাইরে। কারণ, এ সকল লোকের ওপর জুমু'আর নামায ফরজ নয়।' (শরহে মুশকিলুল আছার, ৩/১৮৭)

আল্লামা হাফেয ইবনে আবদুল বার (রহ.) বলেন,

وان الرخصة انما اريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من اهل البوادى والله اعلم، وهذا تاويل تعضده الاصول وتقوم عليه الدلائل، ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له.

'এ হাদীসসমূহে বর্ণিত জুমু'আ তরকের ব্যাপারে অবকাশ দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য, যাদের ওপর জুমু'আ ফরজ নয়। যারা গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী হয়েও ঈদের জামা'আতে শরীক হয়েছে। এ ব্যাখ্যার পক্ষে অনেক উসূল ও দলিল বিদ্যমান রয়েছে। আর যারা এ কথার বিরোধিতা করে, তাদের কোনোই দলিল নেই।'
(আত-তামহীদ, ১০/২৭৪)

সারকথা, জুমু'আ ও ঈদ একই দিনে হলে উভয়টি আদায় করা জরুরি হওয়া ও জুমু'আর নামায ঐচ্ছিক না হওয়াটা কোরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এর বিপরীতে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য কোনো দলিল নেই।

অতএব, যাদের ওপর জুমু'আ ফরজ তাদের ব্যাপারে জুমু'আর নামায ঐচ্ছিক হওয়ার মন্তব্য কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ হবে না। যেমনটি বলেছেন আল্লামা হাফেয ইবনে আবদুল বার মালেকী (রহ.)–

واذا احتملت هذه الاثار من التاويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم ان يذهب الى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه، لان الله عز وجل يقول :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ، ولم يخص الله و رسوله يوم عيد من غيره، فكيف بمن ذهب الى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما فى الكتاب والسنة والاجماع باحاديث ليس منها حديث الا وفيه مطعن لاهل العلم بالحديث ولم يخرج البخارى ولا مسلم منها حديثا واحدا وحسبك بذلك ضعفا لها.

এ হাদীসগুলো যেহেতু উল্লিখিত ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে, তাই কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয হবে না, জুমু'আ রহিত হওয়ার কথা বলা, তাদের ব্যাপারে যাদের ওপর জুমু'আ ফরজ হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জুমু'আর দিন জুমু'আর নামাযের আযান হলে দ্রুত জুমু'আয় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা প্রতি জুমু'আর দিনের জন্যই। আল্লাহ তা'আলা বা তাঁর রাসূল (সা.) ঈদের দিনকে আলাদা করেননি। যার দ্বারা দলিল দেওয়া যেত। অতএব, জুমু'আ এবং যোহর রহিত হওয়ার মন্তব্য কোরআন-সুন্নাহ ও ইজমার পরিপন্থী। তাদের প্রমাণ এমন কিছু হাদীস, যার প্রতিটিতে মুহাদ্দিসগণের আপত্তি রয়েছে। আর এ কারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) এ-সংক্রান্ত একটি হাদীসও তাঁদের কিতাবে উল্লেখ করেননি।
(আত-তামহীদ, ১০/২৭৩-২৭৪)

সুতরাং কোরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে জুমু'আ ও ঈদ একই দিন হলে উভয়টিই আদায় করা জরুরি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন এবং তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২১

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

Index (সূচক)

মূল্যের সূচক, (Price Index) যাকে Index Numbersও বলা হয়। সাধারণ পণ্যের মূল্য মুদ্রার সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়। যথা আমরা বলে থাকি যে, কারেন্সির মূল্য দুইশ টাকা এবং ঘর পাঁচ লক্ষ টাকার। কিন্তু সয়ং মুদ্রার মূল্যমান নির্ধারিত হয় পণ্যের মূল্যের ওপর ভিত্তি করে। যথা–আমরা বলে থাকি দশ বছর পূর্বে একশ টাকার মূল্য এক মণ গম সমপরিমাণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা হয় না। সুতরাং ওই সময় মুদ্রার মূল্য বেশি ছিল ফলে এর বিনিময়ে অনেক জিনিস পাওয়া যেত, বর্তমানে তা কমে গেছে। কেননা ওই মুদ্রা দ্বারা ওই পরিমাণ জিনিস বর্তমানে পাওয়া যায় না। এখন প্রশ্ন হলো, মুদ্রার পরিমাপ নির্ধারণ কিভাবে হবে? এর জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে যে, এমন কিছু পণ্য নির্ধারণ করা হয়, যার ব্যবহার অধিক এবং বিভিন্ন তারিখ অনুসারে ওই পণ্যগুলোর তুলনামূলক মূল্যের বিচার (Comparison) করা হয় তাকেই নির্দেশক/সূচক (Index) বলা হয়ে থাকে।

নির্দেশক/সূচক (Index)-এর পদ্ধতি এবং এর বিভিন্ন ধাপ

আলোচ্য বিষয়ে শরীয়া বিধান সম্পর্কে অবগতি অর্জনের জন্য মূল্যের সূচক নিধারণ পদ্ধতি এবং কারেন্সির মূল্য নির্ধারণে এর ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি। তাই মূল্যের সূচকের সাথে ঋণের সম্পর্ক বিষয়ে অর্থনীতিবিদরা যেই পদ্ধতি অবলম্বণ করে থাকেন নিম্নে তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো,

উল্লেখ্য যে কারেন্সি ধাতব দ্রব্যের হোক বা কাগজের, যে-ই প্রকারেরই হোক না কেন মূলত ওই কারেন্সি মুখ্য নয় বরং এর মাধ্যমে জনসাধারণ নিজেদের জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা (Goods and services) ক্রয় করে। এই দিকটা যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে প্রত্যেক কারেন্সির দুটি মূল্য দাঁড়ায়। একটা হলো তার বাহ্যিক মূল্য (Facevalue), অপরটা হলো তার বাস্তব মূল্য (Realvalue)। বাহ্যিক মূল্য বলতে ওই মূল্যকেই বোঝানো হয়, যা ওই কারেন্সির গায়ে লিপিবদ্ধ থাকে। বাস্তব মূল্য বলতে বোঝানো হয় পণ্য ও সেবার ওই সমষ্টিকে, যা একজন মানুষের পক্ষে ওই কারেন্সি দ্বারা ক্রয় করা সম্ভব। বর্তমান সময়ের অর্থনীতিবিদরা পণ্য ও সেবার উক্ত সমষ্টিকে Basket of Goods বলে থাকেন। যথা–যদি করিমের মাসিক বেতন দশ হাজার টাকা হয় তাহলে ওই দশ হাজার টাকা তার মাসিক আয়ের বাহ্যিক মূল্য। সে ওই দশ হাজার টাকা নিম্নে বর্ণিত পণ্য ও সেবায় ব্যয় করে চাল, কাপড়, গোশত, ডাল, ঘরভাড়া, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যয়, চিকিৎসা ইত্যাদি। তাই সেটাকে পণ্য ও সেবার ঝুড়ি বা Basket of goods and services বলা হয়। এটাই হলো দশ হাজার টাকার বাস্তব মূল্য। সেবা ও পণ্যের ঝুড়িতে উল্লিখিত সব পণ্য ও সেবা একই মানের হয় না বরং কিছুর গুরুত্ব অন্য কিছুর তুলনায় বেশি বা কম হয়। যথা–কাপড়ের তুলনায় চালের গুরুত্ব বেশি। এটা নিরেট সত্য যে, সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাপনে গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের পরিবর্তন বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করে ওই সমস্ত পণ্যের তুলনায় যেগুলোর গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম। তাই চায়ের দাম বৃদ্ধি পেলে জীবনযাপনে অতটুকু সমস্যা হয় না, যতটুকু চালের দাম বৃদ্ধি পেলে হয়। এ জন্য অর্থনীতিবিদরা কারেন্সির বাস্তব মূল্যের মধ্যে পরিবর্তনকে পণ্যের মূল্যের গড় পরিবর্তনের মাধ্যমে জানার জন্য প্রতিটি জিনিসের একটি বিশেষ গুরুত্ব নির্ধারণ করে থাকেন। অতঃপর নির্ধারণকৃত গুরুত্বের ভিত্তিতে প্রতিটি পণ্যের জন্য পৃথক পৃথক নাম্বার নির্ধারণ করেন। উক্ত নাম্বারকে অর্থনীতিবিদরা পণ্যের ওজন (Weight of Commodity) বলে থাকেন এবং এই ধরনের নির্দেশককে ওজনদার নির্দেশক/সূচক (Weighted Index Number) বলে থাকেন। যদি সূচকের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকারের পণ্যের সাথে একই ধরনের মু'আমালা করা হয় এবং সর্বপ্রকারের পণ্যকে একই ওজন দেওয়া যায় তাহলে ওই সূচককে সাদাসিধা সূচক (Simple index number) বলা হয়।

সূচক (Index) তৈরির বিভিন্ন ধাপ

(১) পণ্যের গুরুত্ব নির্বাচন করা (২) প্রতিটি পণ্যকে তার গুরুত্ব বিবেচনায় তার জন্য বিশেষ ওজন নির্ধারণ করা (৩) মৌলিক বছর নির্বাচন করা, অর্থাৎ এই বছরটা এমন হওয়া চাই যে, এতে অর্থনৈতিকভাবে এমন কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়নি, যাতে সাধারণ পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক বেশিও নয়, আবার কমও নয়। দুর্ভিক্ষের বছরও নয়, আবার অধিকতরও নয়। যুদ্ধেরও নয় আবার দীর্ঘকাল নিরাপদও নয়। মোটকথা, এই বছরটা নরমাল একটি বছর। (৪)

মৌলিক বছরের মোকাবিলায় ওই বছর নির্ধারণ করা যার পণ্য মূল্যের সাথে মৌলিক বছরের মূল্যের তুলনা করা যায়। (৫) উভয় বছরের পরিবর্তিত মূল্যের গড় বের করা (৬) পরিবর্তিত গড়কে পণ্যের ওজনের সাথে গুণ দেওয়া হয় (৭) গুণফলকে একত্রিক করে প্রাপ্ত সর্বমোট উভয় বছরের মূল্যের পার্থক্য দাড়াঁয়।

উক্ত তুলনামূলক ব্যবধানকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ ২০০০ সালে ৫০০০ টাকা দিয়ে যা পাওয়া যেত ২০১৫ সালে তা পাওয়া যায় ১০,০০০ টাকা দিয়েও। তাই কোনো ব্যক্তি যদি ২০০০ সালে কারো নিকট থেকে ৫০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ২০১৫ সালে সে ৫০০০-এর পরিবর্তে ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করবে তার পাওনাদারকে। অন্য তাই পাওনাদারের ওপর জুলুম হবে। এ জন্য কিছু কিছু অর্থনীতিবিদ বলেন, বর্তমান যুগে ঋণকে সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট করা জরুরি এবং ওই হিসাব মতেই ঋণ আদায় করা চায়। তাই প্রশ্ন হলো, ঋণ এবং মজুরিকে সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যাবে কি?

Indexation System বা সূচক পদ্ধতি

শরীয়া বিধান অনুসারে ঋণকে সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট করা এবং মজুরি বা পারিশ্রমিককে সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট করার বিধান ভিন্ন ভিন্ন। ঋণ বা কর্জকে সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট করার কোনো অবকাশ ইসলামী শরীয়তে নেই। তবে মজুরি বা পারিশ্রমিকের ব্যাপারে কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে। উভয় বিষয়ের সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১. ঋণকে সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট করার বিধান :

এ বিষয়ে সত্য কথা হলো, ঋণের ওপর উপরোক্ত আধিক্যকে জায়েজ বলা এবং সেটাকে ন্যায়সঙ্গত সাব্যস্ত করা শরীয়াহ নীতিমালা পরিপন্থী। কেননা ইসলামী শরীয়তে গৃহীত ঋণের অনুরূপ সমপরিমাণ আদায় করা ঋণগ্রহীতার ওপর ওয়াজিব। এতে কারো কোনো মতানৈক্য বা দ্বিমত নেই। এমনকি যারা ঋণকে সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট করা বৈধ মনে করেন তাঁরাও ওই নীতিমালাকে স্বীকার করেন। সুতরাং এখন অনুরূপ নির্ধারণের পালা। ইসলাম যে ঋণগ্রহীতাকে ঋণের অনুরূপ আদায় করার কথা বলে উক্ত অনুরূপ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? কেননা অনুরূপের দুটি প্রকার রয়েছে। ১. অর্থগত অনুরূপ। ২. আকৃতিগত অনুরূপ। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে যে-ই অনুরূপের কথা বলা হয়েছে, সেখানে উপরোক্ত প্রকারদ্বয়ের মধ্যে কোন প্রকার উদ্দেশ্য? এখানে অর্থগত অনুরূপ দ্বারা তার মূল্য বোঝানো হয়েছে এবং আকৃতিগত অনুরূপ বলতে বোঝানো হয় সংখ্যার হিসাবে অথবা ওজনের হিসাবে অথবা পাত্রের পরিমাপ হিসাবে যতটুকু ঋণ নিয়েছিল ওই পরিমাণ আদায় করা। এর মূল্য যা-ই হোক না কেন? পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ এবং জনসাধারণের লেনদেন পর্যবেক্ষণ করলে যেই ধারণা পাওয়া যায় তাহলো এ ক্ষেত্রে অনুরূপ দ্বারা আকৃতিগত অনুরূপতা-ই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পরিমাণে সমতা রক্ষা করা জরুরি। মূল্য এবং মূল্যমানের সমতা মুখ্য নয়, উপর্যুক্ত বক্তব্যের ওপর কিছু দলিল-প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হলো–

(১) যদি কোনো ব্যক্তি কারো নিকট থেকে ১ কেজি চাল কর্জ হিসেবে নেয়, এবং কর্জ নেওয়ার সময় এর মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। গ্রহীতা তার কর্জ পরিশোধ করার সময় এর মূল্য হয়ে গেল দুই টাকা। এমতাবস্থায়ও সে এক কেজি চাল পাওনাদারকে পরিশোধ করবে। এর বেশি নয়। অথচ চালের মূল্য হ্রাস পেয়েছে। পাঁচ টাকা থেকে কমে দুই টাকা হয়ে গেছে। এ বিষয়ে পূর্বেকার ও পরবর্তী সময়ের সমস্ত ফকীহর ঐকমত্য রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউই এ বিষয়ে এ কথা বলেননি যে উক্ত অবস্থায় যেহেতু চালের মূল্যমান কমে গেছে, তাই শুধুমাত্র এক কেজি চাল পরিশোধ করা ঋণদাতার ওপর জুলুম বা অন্যায় হবে। চালের মূল্যমান কমে যাওয়াতে ঋণগ্রহীতার ওপর দুই কেজি ৫০০ গ্রাম আদায় করা ওয়াজিব হবে। যেহেতু ঋণ গ্রহণের সময় এক কেজির যেই মূল্যমান ছিল, তা দিয়ে পরিশোধের সময় দুই কেজি ৫০০ গ্রাম পাওয়া যাচ্ছে। ফুকাহায়ে কেরামের উক্ত বক্তব্য প্রমাণ করে যে, এ ক্ষেত্রে যেই অনুরূপতার কথা বলা হয়েছে তা হলো পরিমাণের অনুরূপতা ও সমতা। মূল্য বা মূল্যমানের অনুরূপতা বা সমতা উদ্দেশ্য নয়।

(২) সমস্ত ফকীহর নিকট এটাই সর্বসম্মত যে ঋণ বা কর্জ পরিশোধের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার শর্ত শুধুমাত্র সুদ থেকে মুক্তির জন্য আরোপ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) উপরোক্ত কাঙ্ক্ষিত সমতার বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে বিনিময়সংক্রান্ত সুদবিষয়ক হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু হাদীস নমুনাস্বরূপ পাঠকদের খেদমতে তুলে ধরা হলো–

১.

عن ابى سعيد الخدرىؓ قال كنا نرزق تمرا لجمع على عهد رسول الله ﷺ وهو الخلط من تمر فكنا نبيع صاعين بصاع بلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال لا صاعين تمرا بصاع ولا صاعين حنطة بصاع ولا درهما بدرهمين (جامع الاصول ١/٥٤٦)

অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর যুগে আমাদের নিকট সর্বপ্রকারের মিশ্রিত খেজুর আসত আমরা নিম্নমানের দুই সা' (একটা পরিমাপের নাম) উন্নতমানের এক সা' খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে দিতাম। মহানবী (সা.) এ বিষয়ে যখন অবগত হলেন তখন তিনি বললেন দুই

সা' খেজুরকে এক সা' খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করো না। দুই সা' গমকে এক সা' গমের বিনিময়ে বিক্রি করো না এবং এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো না।

উক্ত হাদীস দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে মহানবী (সা.) মূল্যের সমতা ও অনুরূপতা বিবেচনা করেননি বরং পরিমাণের মধ্যে সমতা ও অনুরূপতার মূল্যায়ন করেছেন। কেননা মহানবী (সা.) জানতেন যে যেই খেজুর দুই সা'-এর বিনিময়ে বিক্রি করা হবে তার মূল্য ওই খেজুরের মূল্যের তুলনায় বেশি হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) এর ওপর রাজি হননি বরং পরিমাণ ও মাপের মধ্যে সমতার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মূল্যের বিবেচনা করেননি।

২

عن ابى سعيد و ابى هريرةؓ ان رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فجائهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال انا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاث قال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا (جامع الاصول ١/٥٥)

অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) জনৈক ব্যক্তিকে খাইবারের কর্মকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন। তিনি যখন ফিরে এলেন তখন মহানবী (সা.)-এর খেদমতে এক প্রকারের উন্নতমানের খেজুর পেশ করলেন। মহানবী (সা.) ওই সময় জিজ্ঞাসা করলেন খায়বারের সমস্ত খেজুরই কি এ ধরনের হয়ে থাকে? প্রতিত্তোরে উক্ত সাহাবী বললেন, আমরা এক সা'কে দুই সা'-এর সাথে এবং দুই সা'কে তিন সা'-এর সাথে পরিবর্তন করে থাকি। তখন মহানবী (সা.) বললেন, ওই রকম করা যাবে না বরং মিশ্রিত খেজুরকে প্রথমে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। অতঃপর উক্ত দিরহাম দ্বারা উন্নতমানের খেজুর ক্রয় করো।

উক্ত হাদীস এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, সুদ সম্পর্কীয় সম্পদের মধ্যে যেই সমতার কথা বলা হয়েছে তাহলো পরিমাণের সমতা। মূল্যের অনুরূপতা ও সমতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা উন্নতমানের খেজুর মিশ্রিত খেজুরের তুলনায় অনেক বেশি মূল্যবান ও উন্নত ছিল তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) এক প্রকারের খেজুরকে অপর প্রকারের খেজুরের সাথে বিনিময় ও পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে উন্নত ও অনুন্নতের মোটেও বিবেচনা করেননি। বরং ওজনের মধ্যে সমতাকে অনিবার্য করে দিয়েছেন।

৩.

عن عبادة ابن الصامتؓ قال رسول الله ﷺ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد (جامع الاصول ١/٥٥٢)

অর্থাৎ হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে, গমকে গমের বিনিময়ে, জবকে জবের বিনিময়ে, খেজুরকে খেজুরের বিনিময়ে এবং লবণকে লবণের বিনিময়ে হাতে হাতে (নগদ) অনুরূপতা ও সমতা রক্ষা করে বিক্রি করো। তবে উক্ত পণ্যগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ে যদি বিনিময়দ্বয় ভিন্নজাতের হয় তাহলে যেমনি ইচ্ছা বিক্রি করো অর্থাৎ তখন সমতা আর অনুরূপতার প্রয়োজন পড়বে না। তবে শর্ত থাকবে যে তাও নগদে হতে হবে।

৪.

عن ابى هريرةؓ قال قال رسول الله ﷺ الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا (جامع الاصول ١/٥٥٤)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেন, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে ওজন করে অনুরূপতা রক্ষা করে বিক্রি করো। রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে ওজন করে অনুরূপতার সাথে বিক্রি করো। এতে যে ব্যক্তি অতিরিক্ত করবে অথবা চাইবে উভয়টা সুদ হবে।

৫.

عن عبادة ابن الصامتؓ ان النبى ﷺ قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدين بمدين والشعير بالشعير مدين بمدين والتمر بالتمر مدين بمدين والملح بالملح مدين بمدين فمن زاد او استزاد فقد اربى (المرجع السابق)

অর্থাৎ হযরত উবাদা ইবনে সামিত থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে চায় সেটা টুকরা হোক বা গলানো, রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে চায় সেটা টুকরা হোক বা গলানো, দুই মুদ (একটা প্রাচীন পরিমাপের নাম) গমকে দুই মুদ গমের বিনিময়ে, দুই মুদ জবকে দুই মুদ জবের বিনিময়ে, দুই মুদ খেজুরকে দুই মুদ খেজুরের বিনিময়ে এবং দুই মুদ লবণকে দুই মুদ লবণের বিনিময়ে বিক্রি করো। যে ব্যক্তি এতে অতিরিক্ত করবে অথবা চাইবে সে সুদে লিপ্ত হলো।

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইসলামী শরীয়তে যেই অনুরূপতা এবং সমতার কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা পরিমাণের মধ্যে সমতা ও অনুরূপতার কথাই বলা হয়েছে, সুদ সম্পর্কীয় সম্পদে মূল্যের ব্যবধানের কোনো গুরুত্ব ও মূল্য নেই। এ-সংক্রান্ত আরো একটি হাদীস রয়েছে, যাতে বিশেষভাবে ঋণ ও কর্জের ক্ষেত্রে অনুরূপতা এবং সমতা রক্ষার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে–

৬.

عن عبد الله بن عمرؓ قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير وآخذ الدراهم وابيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه واعطى هذه من هذه فاتيت رسول الله ﷺ وهو فى بيت حفصة فقلت يا رسول الله! رويدك اسئلك انى ابيع الابل بالبقيع فابيع

بالدنانير وآخذ الدراهم وابيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه فقال رسول الله ﷺ لابأس ان تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شئ (سنن ابى داود كتاب البيوع)

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি বকী নামক স্থানে উট বিক্রি করতাম। কখনো দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করতাম তবে দিনারের পরিবর্তে ক্রেতা থেকে দিরহাম গ্রহণ করতাম আবার কখনো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে এর পরিবর্তে ক্রেতার নিকট থেকে দিনার গ্রহণ করতাম। অর্থাৎ দিনারের পরিবর্তে দিরহাম, দিরহামের পরিবর্তে দিনার নিতাম। পাওনা আদায় করার সময়ও তা-ই করতাম। একদা আমি মহানবী (সা.)-এর খিদমতে হাজির হলাম, যখন রাসূল (সা.) হাফসা (রা.)-এর ঘরে ছিলেন, আমি তখন মহানবী (সা.)-কে বললাম, আমি বকী নামক স্থানে উট বিক্রি করতাম তখন কখনো দিনার হিসাবে মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রি করতাম তবে মূল্য নেওয়ার সময় ক্রেতার নিকট থেকে দিনারের পরিবর্তে দিরহাম গ্রহণ করতাম। আবার কখনো দিরহাম দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রি করতাম তবে নেওয়ার সময় দিরহামের পরিবর্তে দিনার নিতাম। অর্থাৎ দিনারের পরিবর্তে দিরহাম, দিরহামের পরিবর্তে দিনার নিতাম। তদ্রূপ পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রেও। মহানবী (সা.) তাঁর বক্তব্য শুনে বললেন, এ ধরনের লেনদেন করাতে কোনো সমস্যা নেই; তবে শর্ত হলো ওই দিনের মূল্যের সমান হতে হবে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে লেনদেনের কোনো অংশ বাকি থাকা অবস্থায় পৃথক না হতে হবে।

উপরোক্ত হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে এভাবে উপস্থাপন করা যায় যে, নবী করীম (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর জন্য এটাকে বৈধতা দিয়েছেন যে, যখন ক্রয়-বিক্রয় দিনারের মাধ্যমে হবে তখন পরিশোধের দিন দিনারের যা মূল্য দাঁড়াবে ওই মূল্য সমপরিমাণ দিরহাম নিতে পারবে। যেই দিন ক্রেতার জিম্মায় ওয়াজিব হয়েছে ওই দিনের মূল্য বিবেচ্য হবে না। উদাহরণস্বরূপ বিক্রয় চুক্তিতে এক দিনার নির্ধারিত হলো এবং বিক্রির দিন এক দিনারের মূল্য ছিল দশ দিরহাম অথচ ওই দিন ক্রেতা মূল্য আদায় করেনি। কিছুদিন পর যখন ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করার ইচ্ছা করল ওই দিনে তার নিকট দিরহাম ছিল কিন্তু দিনার ছিল না এবং ওই দিন এক দিনারের মূল্য এগার দিরহাম হয়ে গেল। এমতাবস্থায় ক্রেতা বিক্রেতাকে এগার দিরহাম আদায় করবে।

পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর আলোকে সমস্ত ফকীহর নিকট সর্বসম্মত বিষয় হলো ঋণ/কর্জ পরিশোধের সময় পরিমাণের মধ্যে অনুরূপতা ও সমতা রক্ষা করা শর্ত। অনুমানের ভিত্তিতে আদায় করা জায়েজ হবে না। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি কারো নিকট থেকে এক সা' গম কর্জ হিসেবে নিয়ে থাকে এবং এই শর্ত আরোপ করে যে, ঋণগ্রহীতা অনুমান ও আন্দাজের ভিত্তিতে মাপ-পরিমাপ ব্যতীত আদায় করবে। তাহলে কর্জের উক্ত মু'আমালা জায়েজ হবে না। কেননা সুদ সম্পর্কীয় মালের মধ্যে আন্দাজ ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এক সা' পরিশোধ করা জায়েয নেই। এ জন্যই তো মহানবী (সা.) 'বাঈমুযাবানা'কে হারাম করেছেন। বাঈ মুযাবানা বলা হয় গাছে অবস্থিত খেজুরকে নিচে নামানো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করাকে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হারাম হওয়ার মৌলিক কারণ হলো যেই খেজুরগুলো নিচে নামানো রয়েছে ওইগুলো ওজন করে পরিমাণ নির্ধারণযোগ্য আর যা গাছে রয়েছে তার পরিমাণ নির্ধারণ করার অনুমান ও আন্দাজ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই মহানবী (সা.) এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে সম্পূর্ণরূপে সাধারণভাবে হারাম করে দিয়েছেন। অথচ অনেক সময় অনুমান বরাবর শুদ্ধ অথবা এর কাছাকাছি হয়ে যায়। সুতরাং সুদ সম্পর্কীয় মালের মধ্যে কোনো পণ্য/বস্তুকে অপর পণ্য/বস্তুর সাথে বিনিময়ের একমাত্র উপায় হলো বিনিময়দ্বয়কে বাস্তবতার ভিত্তিতে পরিমাণের সমতা রক্ষার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা আন্দাজ ও অনুমানের ভিত্তিতে নয়।

অপরদিকে ঋণ/কর্জকে যদি সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বাস্তব অনুরূপতার বিবেচনা করা হয়নি। বরং একটি অনুমাননির্ভর অনুরূপতার ওপর এর ভিত্তি রাখা হয়েছে। কেননা মূল্যের সূচকের মধ্যে পণ্যের মূল্য কম বা বেশির যে গড় হিসাব বের করা হয় তা অনুমাননির্ভর হয়ে থাকে। যার ভিত্তি এমন এক হিসাব পদ্ধতি, যা অনুমান ও আন্দাজ করেই করা হয়ে থাকে। যথা উক্ত হিসাব পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত পর্যায়সমূহে অনুমান ও আন্দাজনির্ভর কাজ করা হয়।

(১) Index-এ উল্লিখিত পণ্যের নির্ধারণ

এ কথা সবারই জানা যে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত কিছু বিশেষ প্রয়োজন থাকে। তাই একজনের প্রয়োজনীয় জিনিসও অপরজনের প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয় বিধায় একজনের পণ্যের ঝুড়ি অন্যজনের পণ্যের ঝুড়ির তুলনায় ভিন্নতর হয়। কিন্তু Index-এর অন্তর্ভুক্ত ঝুড়ি কেবলমাত্র একটা হয়ে থাকে, যাতে পণ্যগুলোকে ব্যবহারকারীর আধিক্যের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। তাই অনেক সময় এতে এমন এমন পণ্যও অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা অনেকের পুরো জীবনে একবারও প্রয়োজন পড়ে না। ফলে ওই সব পণ্যের বিবেচনায় Index যথার্থতা পায় না। বোঝা গেল, Index-এর মধ্যে অনেক পণ্য কেবলমাত্র অনুমান ও আন্দাজের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(২) পণ্যের গুরুত্ব নির্ধারণ :

দ্বিতীয়তঃ পণ্যের ওজন এবং

ব্যবহারকারীদের হিসাবে এর গুরুত্ব নির্ধারণেও অনুমান ও আন্দাজনির্ভর কাজ করা হয়। কেননা এতে কোনো সন্দেহ নেই যে পণ্যের গুরুত্ব এটা একটা তুলনামূলক বিষয়, যা ব্যক্তির ব্যবধানে ভিন্নতর হয়ে থাকে। অনেক সময় একটি জিনিস একজনের নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হয় আবার অন্যজনের নিকট তা গুরুত্বহীন হয়। Index তৈরি করা হয় এই অনুমানের ওপর যে প্রতিটি জিনিসের যেই গুরুত্ব আমরা নির্ধারণ করেছি, তা সর্বস্তরের ব্যবহারকারীদের বিবেচনায় করেছি এবং মধ্যম মানের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে, যা কেবলমাত্র অনুমান ও আন্দাজের ওপরই হয়ে থাকে নিঃসন্দেহে।

(৩) পণ্যের মূল্য নির্ধারণ :

তৃতীয়ত : বিভিন্ন বছরে পণ্যের মূল্য নির্ধারণও করা হয় অনুমান ও আন্দাজের ভিত্তিতে। কেননা এটাই স্পষ্ট যে একই জিনিসের মূল্য একেক শহরে এবং একেক জায়গায় একেক ধরনের হয়। অথচ Index-এর মধ্যে কেবল এক জায়গার মূল্যই অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। কেননা যদি পুরো এক দেশের Index বানাতে চায় তাহলে সেটা সম্ভব সব জায়গার মূল্যগুলোর একটি গড় হিসাব বের করার মাধ্যমে। আর তা কেবল অনুমানের ভিত্তিতেই সম্ভব নিশ্চিতভাবে না।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে Index তৈরির সব ধাপ কেবল অনুমান ও আন্দাজনির্ভর। কোথাও যদিও খুব সতর্কতার সাথে সূক্ষ্মভাবে হিসাব বের করা সম্ভবও হয়। তখনও এর ফলাফলকে নিশ্চিত এবং বাস্তবসম্মত বলা যেতে পারে না বরং এর কাছাকাছি বলা যেতে পারে অতি জোরে। অথচ পূর্বোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা স্পষ্ট যে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অনুমান এবং আন্দাজনির্ভরতার শর্তারোপ করা জায়েজ নয়। তাই ঋণ/কর্জের পরিশোধকে মূল্যের সূচকের সাথে সম্পৃক্ত করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ হবে না।

নিম্নে ইসলামী ফিকাহ একাডেমি জেদ্দার সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হলো–

ان مجلس مجمع الفقه الاسلامى المنعقدة فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ جمادى الاولى ١٤٠٩ھ الى ٦ جمادى الاولى ١٤٠٩ھ الى ١٥ كانون الاول (ديسمبر ١٩٨٨ء) ـــ قرر مالى العبرة فى وفاء الديون الثابتة ماهى بالمثل وليس بالقيمة لان الديون الثابتة تقضى بامثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمة ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار والله اعلم (مجلة المجمع الفقه الاسلامى الدورة الخامسة العدد الخامس الجزء الثالث ١٤٠٩ھ ص ٢٢٦١)

অর্থাৎ ইসলামী ফিকাহ একাডেমির সভা, যার পঞ্চম সম্মেলন ১ জুমাদাল উলা ১৪০৯ হি. থেকে ৬ জুমাদাল উলা ১৪০৯ পর্যন্ত এবং ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৮ ইং থেকে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৮ ইং পর্যন্ত কুয়েতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সম্মেলন নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত পেশ করে।

যেসব ঋণ কারো জিম্মায় ওয়াজিব হবে ওইগুলোর পরিশোধের ক্ষেত্রে অনুরূপতা বিবেচ্য হবে। মূল্যের হিসাব করা হবে না। কেননা ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অনুরূপতাই বিবেচ্য হয়ে থাকে। সুতরাং ঋণ/কর্জ যা কারো জিম্মায় ওয়াজিব হয় ওইগুলোকে কোনো অবস্থায় সূচকের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে না।

শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সূচকের সাথে সম্পৃক্ত করা :

শ্রমিকদের পারিশ্রমিককে সূচকের সাথে সম্পৃক্ত করার বিষয় যেটা রয়েছে তা নিম্নরূপ হবে। যতক্ষণ না পারিশ্রমিক ঋণে পরিণত হবে ততক্ষণ এর বিধান ঋণের সম্পৃক্ততা থেকে ভিন্ন হবে। তবে পারিশ্রমিক যদি ঋণে পরিণত হয় তাহলে এর হুকুম ও বিধান ঋণের সম্পৃক্ততার বিধানের মতো অভিন্ন হবে।

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো এই, পারিশ্রমিককে সূচকের সাথে সম্পৃক্ত করার সম্ভাব্য তিনটা পদ্ধতি :

প্রথম পদ্ধতি :

মজুরি, বেতন ইত্যাদি, নোট দ্বারা এভাবে ধার্য হবে যে, এত মজুরি বা এত বেতন দেওয়া হবে। ওই সময় মালিক এবং কর্মচারীর মধ্যে এই চুক্তি হবে যে প্রতি বছর মূল্যের সূচক বৃদ্ধির আনুপাতিক হারে বেতনও বৃদ্ধি পাবে। যথা সরকার একজন ব্যক্তিকে মাসিক তিন হাজার টাকায় কর্মচারী নিয়োগ দিল এবং এই চুক্তি করল যে এই বেতন প্রতিবছরের শুরুতে মূল্যের সূচকের বৃদ্ধি অনুপাতে বাড়তে থাকবে। এমতাবস্থায় উক্ত কর্মচারী প্রতিবছরের শেষ পর্যন্ত প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে গ্রহণ করবে এবং বছরের মধ্যখানে সূচকের বৃদ্ধির অনুপাত দেখা যাবে না। তবে যখন নতুন বছর শুরু হবে, তখন সূচক দেখবে যে এক বছরের মধ্যে এতে কতটুকু এবং কোন অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। যথা–মূল্যের সূচকে ৫% অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছিল তাহলে উক্ত কর্মচারীর বেতনেও ওই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং নতুন বছর থেকে তার বেতন তিন হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা হয়ে যাবে। উপরোক্ত পদ্ধতি অনেক দেশে প্রচলিত রয়েছে এবং এ ধরনের সম্পৃক্ততার ইসলামী শরীয়তে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কেননা এমতাবস্থায় উভয় পক্ষ প্রতিবছর বা প্রতি ছয় মাস পর একটা নির্ধারিত আনুপাতিক বৃদ্ধির ওপর একমত হয়েছে। উক্ত আনুপাতিক বৃদ্ধির পরিমাণ যদিও চুক্তির সময় কারো জানা ছিল না কিন্তু ওই মানদণ্ড নির্ধারিত ছিল যার ওপর ভিত্তি করে অনুপাত নির্ধারত হবে। তাই বৃদ্ধির পরিমাণে যেই অজ্ঞতা ছিল, তা বিদূরিত হয়ে গেছে। অথবা বলা যেতে পারে যে প্রত্যেক নতুন বছরের শুরুতে যেই অনুপাতে মূল্যের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে, ওই অনুপাতে বৃদ্ধি পাওয়া মজুরির ওপর উক্ত ইজারা চুক্তির নবায়ন হয়ে যাবে। এতে শরীয়া দৃষ্টিতে কোনো নিষেধাজ্ঞা

নেই।

দ্বিতীয় পদ্ধতি :

মজুরি নোটের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের ওপর নির্ধারিত হয়ে যাবে। কিন্তু চুক্তির সময় শর্ত করে নেবে যে মালিকের জিম্মায় ওই নির্ধারিত পরিমাণ ওয়াজিব নয় বরং এর জিম্মায় ওই পরিমাণ আদায় করা ওয়াজিব হবে, যা মূল্যের সূচকের ভিত্তিতে মাসের শেষে ওই নির্ধারিত পরিমাণের সমান হবে। যথা– রহিম, করিমকে এক মাসের জন্য কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দিল এবং ওই সময় নির্ধারিত হলো যে রহিম, করিমকে মাসের শেষে মূল্যের সূচকের ভিত্তিতে ওই পরিমাণ মজুরি দেবে, যা বর্তমান এক হাজার টাকার সমান হবে। এমতাবস্থায় মূল্যের সূচকে এক মাসে ২% অনুপাতে বৃদ্ধি পেল। তাহলে রহিম, করিমকে মাসের শেষে এক হাজার বিশ টাকা আদায় করবে। কেননা এই এক হাজার বিশ টাকা মাসের শুরুর এক হাজারের সমান। কিন্তু মাসের শেষে যখন এটা নির্ধারিত হয়ে গেল যে বেতন এক হাজার বিশ টাকা বিধায় এই বেতন সব সময়ের জন্য এক হাজার বিশ টাকাই বহাল থাকবে। এর অতিরিক্ত হবে না। সুতরাং মাসের শেষে যদি মালিক উক্ত বেতন আদায় করতে অক্ষম হয়। এমনকি আরো এক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল অথবা আরো একটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল তখনও মালিকের জিম্মায় এক হাজার বিশ টাকা ওয়াজিব হবে। মূল্যের সূচকের বৃদ্ধিতে এতে বৃদ্ধি পাবে না। উদাহারণস্বরূপ ওই সময়টার মধ্যে মূল্যের সূচক যদি ১০% অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। তাই এখন আমাকে এক হাজার বিশ টাকার ওপর ১০০% হিসাবে বৃদ্ধি করে বেতন দেওয়া হোক। কেননা চুক্তির সময় উভয়ের মধ্যে মজুরি বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মাসের শেষে যত টাকা বর্তমান এক হাজারের সমান হবে তা-ই দেওয়া হবে। শুধুমাত্র নির্ধারণের জন্যই মূল্যের সূচক মুখ্য থাকবে। কিন্তু মাসের শেষে যখন মূল্যের সূচকের ভিত্তিতে একবার মজুরি নির্ধারিত হয়ে গেছে এখন আর সেটা দেখার প্রয়োজন নেই। বরং ওই নির্ধারিত মজুরি মালিকের জিম্মায় ঋণ হয়ে গেছে, যাতে ভবিষ্যতে কম বা বেশি করার কোনো অবকাশ নেই। মূল্যের সূচকে যত পরিবর্তন আসুক না কেন। উপরোক্ত পদ্ধতি বিষয়ে যতটুকু শরীয়ার সম্পর্ক রয়েছে, এ ব্যাপারে বিচারপতি মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী (দা. বা.)-এর মতামত হলো, এটাও বৈধ তবে শর্ত হলো, মূল্যের সূচক এবং এর হিসাব পদ্ধতি উভয় পক্ষের নখদর্পণে থাকতে হবে। যাতে পরবর্তীতে অজ্ঞতাবশত পরস্পর মতবিরোধ বা ঝগড়া না হয়। কেননা এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ একমত হয়েছে যে নির্ধারিত মজুরি এক হাজার টাকা নয় বরং মূল্যের সূচকের ভিত্তিতে মাসের শেষে যত টাকা এক হাজার টাকার সমান হবে, তা পরিশোধ করতে হবে মালিককে। যা হিসাব করে বের করার পদ্ধতিও উভয়ের জানা থাকবে। সুতরাং মজুরির ক্ষেত্রে ওই পরিমাণ অজ্ঞতা মতবিরোধ বা ঝগড়ার কারণ হবে না এবং এই পরিমাণ অজ্ঞতা শরীয়তে ধর্তব্য নয়।

তৃতীয় পদ্ধতি :

মজুরি তো টাকার নির্ধারিত পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যাবে। উভয় পক্ষের মধ্যে এই শর্ত থাকবে যে মালিকের জিম্মায় ওই মজুরি ওয়াজিব হবে, যা ইজারা আকদের সময় নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু যেই দিন এই মজুরি পরিশোধ করবে ওই দিন মূল্যের সূচকের মধ্যে যেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে ওই অনুপাতে মজুরিতেও বৃদ্ধি করে আদায় করবে। যথা–এক ব্যক্তি কাউকে এক হাজার টাকা বেতনের ওপর কর্মচারী নিয়োগ দিল এবং উভয়ের মধ্যে এই চুক্তি হলো যে মজুরি এক হাজার টাকাই; কিন্তু মালিকের জন্য জরুরি হবে যে যেই দিন শ্রমিককে উক্ত মজুরি আদায় করবে ওই দিন মূল্যের সূচকে যেই অনুপাতে পণ্যের মূল্যের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে, ওই আনুপাতিক হারে সেও এক হাজার টাকায় বৃদ্ধি করবে। সুতরাং মালিক যদি উক্ত মজুরি মাসের শেষে আদায় করে এবং ওই দিন মূল্যের সূচকে ২% অনুপাতে বৃদ্ধি পায় তাহলে মালিকও ২% অনুপাতে বৃদ্ধি করে এক হাজার বিশ টাকা আদায় করবে। যদি মালিক উক্ত মজুরি এক বছর পরে আদায় করে তাহলে ওই সময় পর্যন্ত মূল্যের মধ্যে ১০% অনুপাতে পণ্যের মূল্যের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই মালিকও ১০% হিসাবে বৃদ্ধি করে এগারশ টাকা আদায় করবে।

এই পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। কেননা এই পদ্ধতিটা ঋণ/কর্জকে মূল্যের সূচকের সাথে সম্পৃক্ত করার মতো। যার ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য :

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সূচকের মাধ্যমে শুধুমাত্র চুক্তিসম্মত মজুরি নির্ধারণ করা হয় এবং সূচকের মাধ্যমে যখন মজুরি একবার নির্ধারিত হয়ে গেছে সুতরাং সূচকের কাজ শেষ। এখন সব সময়ের জন্য ওই নির্ধারিত মজুরিই মালিক আদায় করবে। এটাই তার ওপর ওয়াজিব, এর কম-বেশ হবে না। মালিক যখনই আদায় করুক না কেন।

পক্ষান্তরে তৃতীয় পদ্ধতিতে মজুরি এক হাজার টাকা নির্ধারিত ছিল, যা আদায় না করার ফলে মালিকের জিম্মায় ঋণ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে উক্ত ঋণকে সূচকের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হলো। তাই এই পদ্ধতির বিধানও ওই বিধান হবে, যা এ বিষয়ে ঋণের বিধান।

(ফিকহী মাকালাত খ. ১ পৃ. ৭৪, আহকামুল আওরাকিন্নকদিয়্যাহ পৃ. ২৭, কাগজি নোট আওর কারেন্সি কা হুকুম)

(চলবে ইনশা আল্লাহ)

হিজরী নববর্ষ
ইতিহাসের পুনর্পাঠ

মাওলানা কাসেম শরীফ

তারিখ শব্দটি আরবী। এর প্রচলিত অর্থ ইতিহাস, বছরের নির্দিষ্ট দিনের হিসাব। আল্লামা ইবনে মানজুর (রহ.) তাঁর বিখ্যাত আরবী অভিধান 'লিসানুল আরবে' লিখেছেন :

التاريخ تعريف الوقت يقال أرّخ الكتاب ليوم كذا (لسان العرب : ٤/٣ ماده أرخ)

অর্থাৎ তারিখ হলো, সময়কে নির্দিষ্ট করা, সময়ের চিত্র তুলে ধরা, সময়ের ঘটনাপ্রবাহকে শব্দবদ্ধ করা। আল্লামা আইনী (রহ.) লিখেছেন,

قال الصيداوى : أخذ التاريخ من الارخ، كانه شئ حدث كما يحدث الولد وقيل التاريخ معرب من: ماه وروز، معناه حساب الايام والشهور والاعوام فعربته العرب (عمدة القارى شرح البخارى : ١٧/٦٦)

অর্থাৎ সায়দাভী (রহ.) বলেছেন, 'তারিখ' শব্দটি 'আরখুন' থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ নবজাতক, সদ্যপ্রসূত শিশু। ইতিহাসের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য হলো, নবজাতকের জন্মের মতো ইতিহাসও সৃজিত হয়, রচিত হয়। একের পর এক সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো ইতিহাসের ধারা চলমান, প্রবাহমান। কেউ কেউ বলেছেন, 'তারিখ' শব্দটি অনারবী। 'মা' ও 'রোজ' থেকে পরিবর্তন করে একে আরবীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এর অর্থ : দিন, মাস, বছরের হিসাব।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সংখ্যা গণনা, হিসাব সংরক্ষণের সঙ্গে ইতিহাসের সখ্য অনেক গভীর। সন-তারিখ ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনচরিত রচনা, সময়ের আলোচনা-পর্যালোচনা সন-তারিখ ছাড়া সম্ভব নয়। যদিও এটি ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেশ্য নয়, তবুও সন-তারিখ প্রথা ইতিহাসের অনুষঙ্গ হয়ে আছে সেই আদিকাল থেকে। ফলশ্রুতিতে ইতিহাস বোঝাতে 'তারিখ' শব্দটিকেই ব্যবহার করা হয়।

তারিখ গণনার সূচনা যেভাবে হলো :

তারিখ গণনার সূচনা কিভাবে হলো, কবে থেকে হলো, বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। 'আল মাওছুআতুল ফিকহিয়্যা আল কুয়েতিয়্যা' গ্রন্থে বিষয়টি এভাবে এসেছে :

ইসলাম আসার আগে আরবের সমষ্টিগত কোনো তারিখ ছিল না। সে সময় তারা প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে বছর, মাস গণনা করত। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সন্তানরা কা'বা শরীফ নির্মিত হওয়ার আগে তার আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনা অবলম্বনে তারিখ নির্ধারণ করত। কা'বা শরীফ নির্মাণের পর তারা বিক্ষিপ্ত হওয়া পর্যন্ত এর আলোকেই সাল গণনা করত। তারপর বনু ইসমাঈলের যারা হেজাযের তেহামা অঞ্চল থেকে বেরিয়ে অন্যত্র চলে যেত, তখন সেই গোত্র বেরিয়ে যাওয়ার দিন থেকে তারিখ গণনা করত। যারা তেহামাতে রয়ে যেত, তারা বনি যায়েদ গোত্রের যুহাইনা, নাহ্দ ও সা'দ-এর চলে যাওয়ার দিন থেকে সাল গণনা করত। কা'ব বিন লুআইয়ের মৃত্যু পর্যন্ত এ ধারা চলমান ছিল। পরে তাঁর মৃত্যুর দিন থেকে নতুনভাবে সাল গণনা শুরু হয়। এটা চলতে থাকে হস্তি বাহিনীর ঘটনা পর্যন্ত। হযরত ওমর (রা.) হিজরী নববর্ষের গোড়াপত্তন করার আগ পর্যন্ত আরবে 'হস্তিবর্ষ'ই প্রচলিত ছিল। (আল-কামেল লিইবনিল আছির : ১/৯)

বনু ইসমাঈল ছাড়া আরবের অন্য লোকেরা নিজেদের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে উপলক্ষ করে বর্ষ গণনা করত। যেমন–বাসুস, দাহেস, গাবরা, ইয়াওমু যি-কার, হরবুল ফুজ্জার ইত্যাদি ঐতিহাসিক যুদ্ধের দিন থেকে নতুন নতুন বর্ষ গণনার সূত্রপাত করত। এটা তো গেল আরবদের সাল গণনার বর্ণনা। গোটা বিশ্বের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে বর্ষপঞ্জি গণনা আরম্ভ করা হয়। আদি পিতা আদম (আ.) পৃথিবীতে আগমনের দিন থেকে সাল গণনা শুরু। এ ধারা চলতে থাকে হযরত নূহ (আ.)-এর মহাপ্রলয় পর্যন্ত। এরপর মহাপ্রলয় থেকে নতুন বর্ষপঞ্জি তৈরি করা হয়। এটা চলতে থাকে ইব্রাহীম (আ.) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত। এ বর্ষপঞ্জি চলতে থাকে ইউসুফ (আ.) মিসরে শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত। সে ঘটনা থেকে শুরু হয় নতুন বর্ষ গণনা। এটি চলতে থাকে মূসা (আ.) মিসর ত্যাগের ঘটনা পর্যন্ত। সেটি চলতে থাকে দাউদ (আ.)-এর শাসনামল পর্যন্ত। সেটি চলতে থাকে

সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত। সেটি চলতে থাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত। ঈসা (আ.)-এর জন্ম থেকে নতুন বর্ষ গণনা আরম্ভ হয়। আরবের হিম্য়ার গোত্র তাবাবিয়াহ (ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দিন) থেকে, প্রাচীন আরবের গাস্সান গোত্র বাঁধ নির্মাণের দিন থেকে সাল গণনা করে। সান'আ অধিবাসীরা হাবশীদের ইয়েমেন আক্রমণের দিন থেকে বর্ষ গণনা শুরু করে। তারপর তারা পারস্যদের জয়লাভের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাল গণনা করে। (আল-ই'লান, লিস্ সাখাভী : ১৪৬-১৪৭)

পারসিকরা তাদের রাষ্ট্রনায়কদের চার স্তরে বিন্যস্ত করে সাল গণনা করত। রোমানরা পারসিকদের কাছে পরাজিত হওয়া পর্যন্ত দারা ইবনে দারা নিহত হওয়ার দিন থেকে সাল গণনা করত। কিবতীরা মিসরের রানি কিলইয়ুবাতরাকে রুখতে বুখতে নছর কর্তৃক সাহায্য করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাল গণনা করত। ইহুদীরা বায়তুল মাকদিসে হামলা এবং এটি তাদের হাতছাড়া হওয়ার ঘটনাকে উপলক্ষ করে বর্ষ গণনা করে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উত্তোলনের ঘটনাকে স্মারক বানিয়ে খ্রিস্টবর্ষ পালন করে। (আল মাওছুয়াতুল ফিক্হিয়্যা আল কুয়েতিয়্যা : ১০/২৮ 'তারিখ')

হিজরী নববর্ষের সূচনা

হিজরত ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিশ্বের ইতিহাসেও সবচেয়ে তাৎপর্যবহ, সুদূরপ্রসারী ঘটনা এটি। জোসেফ হেল যথার্থই বলেছেন,

Hijrat is the greatest Turning point in the Vistory History of islam

অর্থাৎ হিজরত ইসলামের গতিপথ পরিবর্তনকারী মহান ঘটনা। এটি দ্বীন ও মানবতার বৃহত্তম স্বার্থে ত্যাগ, বিসর্জনের এক সাহসী পদক্ষেপ। মক্কার কাফেরদের পাশবিক নির্যাতন-নিপীড়ন, অব্যাহত অমানবিক আচরণ, সামজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধকে নীরবে সহ্য করার পর তাদের স্পর্ধা আরো বেড়ে যায়। তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। মহানবী (সা.) ও মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। হিজরতের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের দ্বার উন্মোচিত হয়। সশস্ত্র যুদ্ধে তাগুতী শক্তির মোকাবিলার শুভ সূচনা হয়। উদিত হয় মক্কা বিজয়সহ ইসলামের বিশ্বজয়ের রঙিন সূর্য। হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মারক বানিয়ে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) হিজরী নববর্ষের গোড়াপত্তন করেন। মুসলমানদের জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র চান্দ্র মাসের পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। কেন একটি নতুন সাল গণনা প্রথা চালু করতে হলো–এ নিয়ে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। আল্লামা আইনীর বিবরণ দেখুন : "হিজরী সাল প্রণয়নের কারণ নিয়ে মতবিরোধ আছে। ইবনে সমরকন্দি বলেন, 'হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে চিঠি লিখেছেন যে, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে অনেক ফরমান আসে, কিন্তু তাতে তারিখ লেখা থাকে না। সুতরাং সময়ক্রম নির্ধারণের জন্য সাল গণনার ব্যবস্থা করুন। তারপর ওমর (রা.) হিজরী সালের গোড়াপত্তন করেন'।" (উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইবনুল আছির (রহ.) আল কামিল ফিত্ তারিখের মধ্যে এটিকে প্রসিদ্ধতম ও বিশুদ্ধতম অভিমত বলে আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন : প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ৮)

আল্লামা আইনী তারপর লিখেছেন, ''আবুল ইক্জান বলেছেন : হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে একটি দলিল পেশ করা হয়, যাতে কেবল শা'বান মাসের কথা লেখা হয়। তিনি বলেন : এটা কোন শা'বান! এ বছরের শা'বান নাকি আগামী বছরের শা'বান? তারপর হিজরী সন প্রবর্তন করা হয়।' (উল্লেখ্য যে, আল্লামা শিবলী নোমানী (রহ.) এ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দেখুন : আল ফারুক : পৃ. ১৯৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত : যখন হযরত ওমর (রা.) সন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি পরামর্শ সভার আহ্বান করেন। সভায় হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত থেকে সাল গণনার প্রস্তাব দেন। হযরত তালহা (রা.) নবুয়তের বছর থেকে সাল গণনার অভিমত ব্যক্ত করেন। হযরত আলী (রা.) হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে বর্ষ গণনার প্রস্তাব দেন। তারপর তাঁরা সকলে আলী (রা.)-এর প্রস্তাবে ঐকমত্য পোষণ করেন। এরপর কোন মাস থেকে শুরু হবে–এ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) রজব থেকে শুরু করার প্রস্তাব দেন। কেননা এটি চারটি সম্মানিত মাসের মধ্যে প্রথমে আসে। হযরত তালহা (রা.) রমাজান থেকে শুরু করার কথা বলেন। কেননা এটি উম্মতের মাস। হযরত আলী (রা.) ও

উসমান (রা.) মুহাররম থেকে শুরু করার পরামর্শ দেন। (উমদাতুল ক্বারী : ১৭/৬৬)

বর্ষ গণনা হিজরত থেকে কেন, মুহাররম থেকে কেন?

বর্ষ গণনার ক্ষেত্রে হিজরতের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ কী? অথচ মহানবী (সা.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তিসহ আরো একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে সাল গণনা শুরু করা যেত। এ প্রশ্নের উত্তর আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) এভাবে দিয়েছেন :

وافاد السهيلى ان الصحابة اخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم، لانه من المعلوم انه ليس اول الايام مطلقا فيعين انه اضيف الى شئ مضمر وهو اول الزمن الذى عز فيه الاسلام وعبد فيه النبى ﷺ ربه آمنا، وابتدأ بناء المسجد، فوافق رأى الصحابة إبتداء التاريخ من ذلك اليوم (فتح البارى ٧/٢٦٨)

অর্থাৎ : সুহাইলী (রহ.) এ বিষয়ে রহস্য উন্মোচন করেছেন। তিনি বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম সাল গণনার বিষয়ে হিজরতকে প্রাধান্য দিয়েছেন সূরা তাওবার ১০৮ নম্বর আয়াতের প্রেক্ষিতে। সেখানে প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নামায আদায় করতে বলা হয়েছে। এই 'প্রথম দিন' ব্যাপক নয়। এটি রহস্যাবৃত। এটি সেই দিন, যেদিন ইসলামের বিশ্বজয়ের সূচনা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিরাপদে, নির্ভয়ে নিজ প্রভুর ইবাদত করেছেন। মসজিদে কোবার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ফলে সেদিন থেকে সাল গণনার বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম মতৈক্যে পৌঁছেছেন। (ফতহুল বারী : ৭/২৬৮)

তিনি আরো বলেছেন :

ويمكن ان يورخ بها اربعة، مولده ومبعثه وهجرته ووفاته، فرجع عندهم جعلها من الهجرة، لان المولد والمبعث لايخلو واحد منهما من النزاع فى تعيين السنة، واما وقت الوفاة فاعرضوا عنه لما توقع بذكره من الاسف عليه فانحصر فى الهجرة (فتح البارى بنفس المرجع)

অর্থাৎ : মহানবী (সা.)-এর জন্ম, নবুয়ত, হিজরত ও ওফাত-এ চারটার মাধ্যমে সাল গণনা করা যেত। কিন্তু জন্ম ও নবুয়তের সাল নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে, আর মৃত্যু শোকের স্মারক। তাই অগত্যা হিজরতের মাধ্যমেই সাল গণনা আরম্ভ করা হয়।

মুহাররম থেকে শুরু করার কারণ :

আল্লামা সালমান মনসুরপুরী (দা.বা.) লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ৫৩ বছর বয়সে নবুয়তের চতুর্দশ বছর ৮ রবিউল আউয়াল, সোমবার কোবা নগরীতে অবতরণ করেছেন। ইংরেজি হিসেবে যা ২৩ সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রিস্টাব্দ। (রহমাতুল লিল আলামিন : ১/১০২)

মূল কথা হলো, মহানবীর হিজরত হয়েছে রবিউল আউয়াল মাসে। তাহলে হিজরী বর্ষ মুহাররম মাস থেকে কেন শুরু করা হয়? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা ইবনে কাছির (রাহ.) লিখেছেন :

فجعلوا السنة الاولى سنة الهجرة وجعلوا أولها المحرم كما هو المعروف، لئلا يختلط النظام (البدايه والنهاية ٤/٥١٣)

অর্থাৎ : অতঃপর তারা হিজরত থেকেই সাল গণনা শুরু করল। আর মুহাররমকে প্রথম মাস হিসেবে স্বীকৃতি দিল। কেননা তৎকালীন আরবে মুহাররমই প্রথম মাস হিসেবে পরিচিত ছিল। জনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে বিঘ্ন না হয়, সে জন্য এটাকে পরিবর্তন করা হয়নি। (বেদায়া নেহায়া : ৪/৫১৩)

আল্লামা ইবনে হাজর (রহ.) লিখেছেন :

وانما اخروه من ربيع الاول الى المحرم ـــ ابتداء العزم على الهجرة كان فى المحرم ـــ فكان اول هلال استهل بعد البيعة ـــ هذا اقوى ما وقفت عليه (فتح البارى ٧/٢٦٨)

অর্থাৎ : রবিউল আউয়ালকে বাদ দিয়ে মুহাররম থেকে সাল গণনা শুরু করা হয়েছে। কেননা হিজরতের সূচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে মুহাররম থেকে। আর আকাবার দ্বিতীয় শপথও হয়েছে মধ্য জিলহজে। এ ভগ্ন মাসের পর নতুন চাঁদ উদিত হয়েছে মুহাররম মাসে। তাই একে দিয়েই বছর গণনা শুরু করা হয়েছে। আমার জানা মতে, এটি দৃঢ়তম অভিমত। (ফতহুল বারী : ৭/২৬৮)

আল্লামা শাওকানী (রাহ.)-এর মতে, মাসগুলোর এই ধারাবাহিকতা আল্লাহ প্রদত্ত। তিনি লিখেছেন :

ان الله سبحانه وضع هذه الشهور وسماها باسمائها على هذا الترتيب المعروف يوم خلق السموات والارض (تفسير فتح القدير : ٢/٤٠٩)

এ বিষয়ে আল্লামা বগভীর বর্ণনাও অনুরূপ। (তাফসিরে বগভী : ২/৩৪৫, সূরা তাওবা : ৩৬)

চন্দ্র মাসের বৈশিষ্ট্য, কিছু দুর্লভ তথ্য

আল্লামা রশিদ রেজা (রহ.) লিখেছেন,

وحكمته العامة انما يمكن العلم بها بالروية البصرية للاميين والمتعلمين فى البدووالحضر على سواء الخ

অর্থাৎ : চন্দ্র মাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, শহরে-গ্রামে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোকেরা সচক্ষে তা অবলোকন করতে পারে। এর জন্য ধর্মীয় কিংবা জাগতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। সরকারেরও হস্তক্ষেপ চলে না এখানে। (তাফসিরে মানার : ১০/৩৫৮)

চন্দ্র বর্ষ সূর্য বর্ষ থেকে দ্রুত ফুরিয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ১০.৮৯ দিন। প্রতি ৩৩ চন্দ্র বছর ৩২ সূর্য বর্ষের সমান। চন্দ্র বর্ষ বছরের সব ঋতুতে ঘূর্ণায়মান থাকে। এটি ৩২.৫ বছরে পূর্ণতা লাভ করে। কেউ ৩২-৩৩ বছর রোজা রাখলে বছরের সব ঋতুতে রোজা রাখার সুযোগ পায়। হিজরী সন দিয়ে সর্বপ্রথম তারিখ লিখেছেন হযরত ই'আলা বিন উমাইয়া (রা.) (উমদাতুল ক্বারী : ১৭/৬৬)

আরবী বর্ষ একত্রিশা হয় না। আল্লামা মাগরিভী (রহ.) লিখেছেন : আরবী মাস লাগাতার চার মাস ত্রিশা হতে পারে, এর বেশি নয়। আর ঊনত্রিশা চাঁদ একাধারে তিন মাস হতে পারে। (আল ইয়াওয়াকীতুল আসরিয়া : ১৪৯)

হযরত জাফর সাদিক (রহ.) থেকে বর্ণিত : কোনো রমাজানের পঞ্চম তারিখ পরের রমাজানের প্রথম তারিখ হয়। (প্রাগুক্ত : ১৪২)

১২০৫ খ্রি. ৬০০ হিজরীতে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী (রহ.) বঙ্গ বিজয় করে হিজরী সন চালু করেন। ৯৬৩ হিজরী, ১৫৫৮ খ্রি. সম্রাট আকবর ফসলী সন বা বঙ্গাব্দ চালু করা পর্যন্ত মোট ৩৬৩ বছর ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম হিজরী সন মোতাবেক পরিচালিত হয়।

হিজরী ক্যালেন্ডার ছাড়া অন্যান্য ক্যালেন্ডার অনুসরণের বিধান

হিজরী সন মুসলমানদের সন। মুসলমানদের উচিত এর অনুসরণ করা। এ ক্ষেত্রে উদাসীনতা কাম্য নয়। উম্মতের ওপর এর খোঁজখবর রাখা ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ কেউ কেউ এর খবরাখবর রাখলে সবার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সবাই যদি এ বিষয়ে উদাসীনতা দেখায়, তাহলে প্রত্যেকেই গোনাহগার হবে। তবে প্রয়োজনে অন্য ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা অবৈধ নয়। বিশেষত খ্রিস্টাব্দ ও বঙ্গাব্দ বাংলাদেশে অনুসরণ করা হয়। এগুলোর অনুসরণে শরয়ী নিষেধাজ্ঞা নেই। খ্রিস্টবর্ষ খ্রিস্টানদের হাতে প্রবর্তিত হয়েছে বলে একে হারাম বলার সুযোগ নেই। কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সূর্য, চন্দ্র উভয়কে হিসাব-নিকাশ ও বর্ষ গণনার জন্য সৃষ্টি করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

هوالذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب (يونس ٥)

তরজমা : তিনিই সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময় করেছেন। আর চন্দ্রকে করেছেন স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারী। তারপর এর জন্য মানজিল স্থির করেছেন, যাতে তোমরা বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো। (সূরা ইউনুস : ৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছির (রহ.) লিখেছেন :

فبالشمس تعرف الايام، وبسير القمر تعرف الشهور والاعوام (ابن كثير ٢١٧/٤)

অর্থাৎ : সূর্যের উদয়-অস্তের মাধ্যমে দিবসকে জানা যায়। চাঁদের আসা-যাওয়ার মাধ্যমে মাস, বছর চেনা যায়। (ইবনে কাছির : ৪/২১৭)

উল্লিখিত আয়াতের সমপর্যায়ের বক্তব্য দেখা যায় সূরা আনআমের ৯৬ নাম্বার আয়াতে, সূরা রহমানের ৫ নাম্বার আয়াতে এবং সূরা বনি ইসরাঈলের ১২ নাম্বার আয়াতে। একই সঙ্গে এসব আয়াতের মাধ্যমে মহাকাশবিদ্যা অর্জনে উৎসাহিত করা হয়েছে। সাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে হিজরী সন ছাড়া অন্য সন অনুসরণের বিষয়ে ফোক্বাহায়ে কেরামের অভিমত নিম্নরূপ :

ذهب الحنيفة والمالكية والشافعية وهو الصحيح عند الحنابلة الى ان المتعاقدين اذا استعملا التاريخ غير الهجرى فى المعاملات تنتفى الجهالة ويصح العقد (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩/١٠)

অর্থাৎ : চার মাজহাব অনুসারেই ক্রেতা-বিক্রেতা যখন লেনদেনের ক্ষেত্রে হিজরী তারিখ ছাড়া অন্য তারিখ ব্যবহার করে, তখন সময় নির্ধারণসংক্রান্ত জটিলতা কেটে যাবে। বেচাকেনাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, সে তারিখের ব্যবহার তাদের জানা থাকতে হবে। (আল মাউযুয়া : ১০/২৯)

তা ছাড়া ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাবগুলোতে পারসিকদের ব্যবহৃত দিবস 'নাইরুজ' ও 'মেহেরজান' ঘিরে ব্যাপক আলোচনা এসেছে। এসবই হিজরী ক্যালেন্ডার ছাড়াও অন্য ক্যালেন্ডার অনুসরণের বৈধতার প্রমাণ বহন করে।

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-১৭

মুফতী ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণের বাস্তবতা

মাযহাবের প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের সমস্ত লেকচারের সার বিষয় হলো, শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ। কথাটি বাহ্যিকভাবে খুবই যুক্তিসঙ্গত। এবং কেউ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। অনেকের কাছে বিষয়টি এ জন্য গ্রহণযোগ্য মনে হবে যে, তিনি শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করতে বলেছেন। কিন্তু এখানে একটি আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, ডা. জাকির নায়েক একজন মুসলমান হয়ে কিভাবে কোরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করবে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেননি তিনি। শুধু ডা. জাকির নায়েক কেন, কোনো আহলে হাদীস বা সালাফীই এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন না। কারো জন্য এ কথা বলা যথেষ্ঠ নয় যে তুমি কোরআন মানো! কারণ যদি মূল উদ্দেশ্য তা-ই হতো, তাহলে যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠানোর কী দরকার ছিল? কা'বা ঘরের ওপর আল্লাহ তা'আলা কোরআন অবতীর্ণ করে এই ঘোষণা দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, তোমরা কোরআন অনুসরণ করো! আল্লাহর কথা গ্রহণ করো! কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে উম্মতকে দ্বীন শিখিয়েছেন। নবী কারীম (সা.) থেকে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের থেকে তাবেঈন দ্বীন শিখেছেন। আর দ্বীনের শিক্ষার এই ধারা অদ্যাবধি চলে এসেছে। অথচ এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে যে তারা শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীসের ওপর আমল করবে। কিন্তু কিভাবে যে কোরআন ও সহীহ হাদীসের ওপর আমল করবে, সেটা আর কেউ ব্যাখ্যা করে না। তারা কি কোরআনের অনুবাদ পড়ে কোরআন মানবে? বুখারীর অনুবাদ পড়ে সহীহ হাদীস মানবে? এ কথাটির বিশ্লেষণ জরুরি।

আলোচনার শুরুতে আমরা একটি প্রশ্ন করতে চাই যে, কারো জন্য কোরআনের মনগড়া, একেবারে নিজস্ব ব্যাখ্যা দেওয়া জায়েজ আছে কি না? সাধারণভাবে আমরা এ প্রশ্নটা যদি কোনো মুসলমানকে করি, সে ইসলাম ধর্ম বুঝুক চাই না বুঝুক, প্রত্যেকেই উত্তর দেবে যে, না–কোরআনের ব্যাপারে আমরা আমাদের মনগড়া কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারি না কিন্তু এক শ্রেণীর অতি-উৎসাহী লোক পাওয়া যাবে, যারা বলবে, প্রত্যেকেরই কোরআন বোঝার অধিকার আছে, প্রত্যেকেরই কোরআন নিয়ে গবেষণা করার অধিকার আছে, অথচ আলেমগণ বিভিন্ন কথা বলে কোরআনের তাফসীর করতে নিষেধ করেন, কোরআনের ব্যাখ্যা দিতে নিষেধ করেন। কেউ যদি নিজে কোরআন বোঝার যোগ্যতা রাখে, কোরআন নিয়ে গবেষণা করার অধিকার রাখে, তবে সেই কথাটা আরেকজনকে বোঝাতে বা বলতে দোষের কী? আলেমরা কোরআন-হাদীসকে কুক্ষিগত করে রাখতে চান। এ জন্য কোরআনের তাফসীর করতে নিষেধ করে থাকেন?

প্রকৃতপক্ষে কোরআন নিয়ে গবেষণা করা এবং কোরআন বোঝার অধিকার প্রত্যেক মানুষের রয়েছে। সে মুসলমান হোক কিংবা অমুসলিম। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলা কোরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির ও গবেষণার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না। কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها

তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করে না, নাকি তাদের হৃদয় তালাবদ্ধ? (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং ২৪)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

তারা কি কোরআন নিয়ে গবেষণা করে না! যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা তাতে অনেক বৈপরীত্য খুঁজে পেত [সূরা নিসা-আয়াত নং ৮২]

সুতরাং মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেরই কোরআন বোঝা ও গবেষণা করার অধিকার আছে। আর বাস্তব সত্য হলো, কোরআন থেকে দূরে সরে আসার কারণেই আজ মুসলিম উম্মাহর এই করুণ পরিণতি।

কোরআন বোঝা, গবেষণা করা এবং কোরআনের ব্যাখ্যাদানের বিষয়টি একটু আলোচনাসাপেক্ষ।

আমরা জানি যে, ইহুদী, খ্রিস্টান প্রত্যেক ধর্মের লোকের জন্য কোরআন বোঝার অধিকার আছে। মুসলিম বিশ্বে যে সমস্ত খ্রিস্টান মিশনারি কাজ করে, তাদের সম্পর্কে যারা জানেন, তাঁদের নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট নয় যে, তারা মুসলমানদেরকে খ্রিস্টবাদের দিকে আহ্বান করার সময় কোরআন থেকে প্রমাণ পেশ করে। যা কোরআনের মনগড়া এবং বিকৃত ব্যাখ্যা বৈ কিছুই নয়। যেমন,

তারা বলে, কোরআনে হযরত ঈসা (আ.)-কে 'কালিমাতুল্লাহ' বলা হয়েছে। আল্লাহর একটি সত্তাগত গুণ হলো, সিফতে কালাম। সুতরাং হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর সত্তার একটি অংশ বা সিফত। কোরআনে হযরত ঈসা

(আ.)-কে 'রুহুল্লাহ' বা আল্লাহর রূহ বলা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর রূহ ছিলেন। আর হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক এমন, যেমন দেহ ও আত্মার সম্পর্ক। আর কোরআনে বলা হয়েছে, আমি ঈসা (আ.)-কে রুহুল কুদুস দ্বারা শক্তিশালী করেছি। আর এর দ্বারা তারা ওই
ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দেয়, যা বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে যে, রুহুল কুদুস হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর কবুতরের আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছিল। দেখুন! খোদা, কালেমা ও রুহুল কুদুস–এ তিনটি মৌলিক উপাদানই কোরআন দ্বারা প্রমাণিত হলো। অর্থাৎ যে কোরআন ত্রিত্ববাদের ঘোরবিরোধী, এই নতুন ব্যাখ্যার বদৌলতে স্বয়ং কোরআনের দ্বারাই এ অসার আকীদার প্রমাণ মিলে গেল। এখন শুধু থেকে গেল কোরআনের ওই আয়াত, যাতে স্পষ্টভাবে ত্রিত্ববাদের কথা নিষেধ করা হয়েছে।

সুতরাং যেহেতু ত্রিত্ববাদের আকীদা প্রমাণিত হয়ে গেল, তাহলে বলা যায়, এই আয়াতে প্রকৃত ত্রিত্ববাদের কথা নিষেধ করা হয়েছে। আর এ কথা খোদ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরাও স্বীকার করে যে খোদা মূলত তিনজন নয় বরং এ তিনটি মৌল উপাদানের সমন্বয়ে মূলত একজনই। আর কোরআনে যে বলা হয়েছে, যারা মসীহ ইবনে মরিয়মকে আল্লাহ বলবে, তারা কাফের? এটা মূলত মনোফেসি ফেরকার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। যেখানে যেখানে নাসারাদের জাহান্নামের আযাবের কথা বলে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ক্যাথলিক ফেরকা নয় বরং এর দ্বারা মনোফেসি ফেরকাকে সম্বোধন করা হয়েছে। বাকি রইল এ কথা যে কোরআনে কারীমে বলা হয়েছে যে হযরত ঈসা (আ.)-কে শূলে চড়ানো হয়নি, এটাও ঠিক। খ্রিস্টানদের সাধারণ আকীদা হচ্ছে, হযরত ঈসা (আ.)-এর মধ্যে নিহিত খোদায়ী মৌল উপাদান শূলে চড়ানো হয়নি। শুধু পেট্রিপেশন ফেরকা এই আকীদা পোষণ করে যে হযরত ঈসা (আ.)-এর মধ্যে নিহিত খোদায়ী মৌল উপাদানের সমষ্টিকে শূলে চড়ানো হয়েছিল। কোরআনে এটাই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আর হযরত ঈসা (আ.)-এর শরীর সম্পর্কে কথা হলো, কোরআনে তাঁর গঠানাকৃতিকে ফাঁসিতে ঝোলানোর কথা অস্বীকার করা হয়নি।

এই ধারাবাহিকতায় খ্রিস্টধর্মের অন্যান্য বিষয়গুলোও তারা খুব সহজে কোরআনের দ্বারা ব্যাখ্যা ও প্রমাণ করে থাকে।

আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী 'আসরে হাজের মে ইসলাম কেইসে নাফেয হোঁ? নামক কিতাবে পাকিস্তানে কোরআন ব্যাখ্যার নতুন ধারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন,

'পাকিস্তানে ইসলামী গবেষণা পরিষদের মহাপরিচালক ড. ফজলুর রহমান তাঁর লিখিত 'ইসলাম' গ্রন্থে' অত্যন্ত জোরালোভাবে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে,

ইসলামে মৌলিকভাবে মূলত তিন ওয়াক্তের নামায ফরজ করা হয়েছে। নবী করীম (সা.)-এর জীবনের শেষ বছরে আরো দুই ওয়াক্তের নামায সংযোজন করা হয়। এ জন্য নামাযের রাক'আতেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এর কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'মোট কথা এই সত্যতা যে মৌলিকভাবে শুধু তিন ওয়াক্তের নামাযই ফরজ ছিল, এর সাক্ষ্য ওই ঘটনা দ্বারা দেওয়া সম্ভব যে, এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূল (সা.) কোনো কারণ ছাড়াই চার নামাযকে দুই ওয়াক্তের নামাযে জমা করেছিলেন। সুতরাং নববী যুগের পর নামাযের সংখ্যা অত্যন্ত
কঠোরভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হয়। আর সত্য কথা হলো, মৌলিকভাবে নামায তিন ওয়াক্ত, হাদীসের স্রোতের টানে যা পাঁচ ওয়াক্তের বর্ণনায় তলিয়ে গেছে।'

অতঃপর আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব (দা. বা.) লিখেছেন,

'সংস্কারবাদীদের তাফসীরের নমুনা দেখনু! সেখানে আপনি নতুন ব্যাখ্যার স্বরূপ দেখতে পাবেন। ওই লোকদের কাছে 'ওহী' হচ্ছে রাসূল (সা.)-এর কালাম, ফেরেশতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। ইবলিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পশুত্ব শক্তি। ইনসান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সত্যলোক। মৃত্যু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তন্দ্রা, জিল্লতি ও কুফর। জিন্দা হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সম্মান ফিরে পাওয়া, হুশ ফিরে আসা বা ইসলাম গ্রহণ করা। পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করার অর্থ হলো, লাঠির ওপর ভর করে পাহাড়ে আরোহণ করা। এই তাফসীরের কথা মাথায় রেখে চিন্তা করুণ যে, খ্রিস্টানদের ব্যাখ্যার সাথে এদের ব্যাখ্যার মধ্যে যেকোনো পার্থক্য নেই? এ বিষয়ে আমি অতিরঞ্জিত কিছু বলেছি কি না?

মদীনা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত কাজী জাহান মিয়ার আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ, সমকাল পর্ব-১। নিচে সমকাল পর্ব-১ থেকে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হলো–

মেজর কাজী জাহান মিয়ার সমকাল পর্ব-১-এ লিখেছেন,

'ইয়াজুজ-মাজুজ কোনো অতিপ্রাকৃতিক জীব নয়, সাধারণ মানুষ। যারা আবিষ্কার ও অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা আল্লাহর দুনিয়া হতে আল্লাহর আইনকে মুছে দিয়ে তাদের নিজস্ব আইন প্রচলন করে এবং সম্পদের একচ্ছত্র ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সাধারণ মানুষের

রিযিক হরণ ও জনজীবন অশান্তি ও ক্ষতি সৃষ্টির কারণ হয় এবং পরিণামে ইসলামের মূলোৎপাটন যাদের কার্যক্রম ধাবিত হয়? কোরআনের পরিভাষায় তারাই ইয়াজুজ! প্রচলিত ধারণায় পাহাড় হতে লাফিয়ে পড়ার ভয়ঙ্কর জীবদের তথ্য সত্য নয়' কল্পনাপ্রসূত! সিঙ্গার ফুৎকারে কিয়ামত হয়ে যাওয়া (ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত ১৮:৯৯) এর ধারণাও সত্য নয়। সুস্পষ্টভাবে এটি Globalizatio বা এক বিশ্বায়নের চিত্র।'

এখানে তিনি তাঁর বিকৃত, মনগড়া, কল্পনাপ্রসূত একটি ধারণাকে প্রমাণ করতে গিয়ে ইসলামে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সকল বিষয়কে অস্বীকার করেছেন। এমনকি সিঙ্গা ফুৎকারে কিয়ামত হওয়ার বিষয়টিও অস্বীকার করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)

আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম হলো,

'এই সেই ফিইফা'

কাজী জাহান মিয়া তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে কোরআনের ১৭ নং সূরার ১০৪ নং আয়াতকে উপস্থাপন করেছেন। কোরআনের আয়াত ও তার অর্থ নিম্নে প্রদান করা হলো–

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيْ إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

অর্থ : অতঃপর আমি বনী ইসরাইলকে বললাম, তোমরা ভূপৃষ্ঠে বসবাস করো, এরপর যখন পরকালের প্রতিশ্রুতিকাল এসে পড়বে, তখন আমি সবাইকে একত্রিত করে উপস্থিত করব।

আর কাজী জাহান মিয়া এ আয়াতের অনুবাদ করেছেন, 'অতঃপর আমি বনী ইসরাইলকে বলিলাম পৃথিবীতে তোমরা বসবাস করিতে থাকো এবং যখন তোমাদের প্রতি আল্লাহর শেষ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে তখন তিনি তোমাদের সকলকে 'ফিইফা'তে একত্রিত করিবেন। (১৭:১০৪)

পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, কোরআন প্রতিশ্রুত ফি-ই -ফা কি? (فيـــفـــا) (fayafin) এর আভিধানিক অর্থ হলো অর্থ মরুভূমি। কিন্তু (فيـــــــــفة) (faifa/faifan) শব্দটির আরো সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করেছেন F.Steingass-dangerous desert wKsev dangerous plain. সুতরাং ১৭:১০৪ আয়াতে বনী ইসরাইলের একত্রীকরণের প্রতিশ্রুত বিষয়টি অবশ্যই একটি বিপজ্জনক একত্রীকরণ, যা মূলত ইসরাইল জাতির সর্বনাশের সঙ্গে জড়িত।'

সুধী পাঠক! কোরআন ব্যাখ্যার কারিশমা দেখুন! কাজী জাহান মিয়া কোন কোরআন পাঠ করেছেন আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। আমরা জানি না, তাঁর ওপর নতুন কোনো কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে কি না। আমরা যে কোরআন পাঠ করি এবং রাসূলের (সা.) ওপর যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে 'লা ফী ফা' আছে। অথচ জাহান মিয়ার কোরআনে লাম নেই। তিনি এ নতুন কোরআন কোথায় পেলেন কে জানে? লাম বাদ দিয়ে 'ফি-ইফা' নিয়ে কত কী না লিখেছেন।

সুধী পাঠক! পৃথিবীর সব কোরআনে লাফীফা আছে। আর আরবী ভাষায় 'লাফীফা' অর্থ হলো, একত্র করা। মূল ধাতু হলো, ف-ف-ل (লাম-ফা-ফা)। আরবী জানা একটি শিশুও বুঝবে যে, ধাতুর মূল অক্ষর ফেলে দিলে শব্দই ঠিক থাকে না।

নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এ ধরনের গবেষক-বুদ্ধিজীবীরা কত কিছুরই না আশ্রয় নিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে কোরআন তৈরি করেন। কোরআনের অর্থ তৈরি করেন। কখনো হাদীস অস্বীকার করেন। কোরআন অস্বীকার করে থাকেন।

কাজী জাহান মিয়া তাঁর বইয়ে ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কে লিখেছেন,

কাজী জাহান মিয়া আহমদ, তিরমিযী বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেখানে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ইনশাআল্লাহ বলার বদৌলতে ইয়াজুজ-মাজুজ দেয়াল ভাঙতে পারবে। এ সম্পর্কে কাজী জাহান মিয়া লিখেছেন,

'আহমেদ, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসের উদ্ধৃতিতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর রেয়ায়েত হতে বর্ণিত একটি হাদীস এ যুগে একটি বিস্ময় ও জিজ্ঞাসাবাদের সৃষ্টি করে। (এরপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, অবশেষে তিনি লিখেছেন)

'এ হাদীস বা উদ্ধৃতিগুলো কি সত্য' এর সহজ উত্তর না। (নাউযুবিল্লাহ)

ইয়াজুজ-মাজুজের ব্যাপারে তিনি একটা সূত্র দিয়েছেন,

বনী ইসরাইলের একত্রীকরণ ইয়াজুজ-মাজুজের দুনিয়াজোড়া নিয়ন্ত্রণ! অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজ=দুনিয়ার শীর্ষতম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে যারা (রাষ্ট্র, জাতি, সম্প্রদায়, ব্যক্তি)

প্রচলিত তাফসীরসমূহের কতকে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে এমন ধারণা দেওয়া হয়েছে যে উঁচু উঁচু পাহাড় হতে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসবে একটি বিশেষ জীব, যার লক্ষ্যবস্তু হবে মুসলমান। তারা এসে একসঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত পানি চুষে খেয়ে ফেলবে। কোরআন এমন সব ব্যাখ্যায় কোনো দায়িত্ব বহন করে না। একই পৃষ্ঠায় পরবর্তীতে তিনি লিখেছেন, 'অতএব গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার সাথে সংশ্লিষ্ট জাতি সত্তাই হবে কোরআনের উপসর্গ অনুযায়ী ইয়াজুজ-মাজুজ।

কাজী জাহান মিয়া লিখেছেন, বলা দরকার যে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইবনে খালদুন হতে প্রাপ্ত শিক্ষায় জ্ঞানী

সম্প্রদায়ের সুবিশাল অংশ একে একটি হযরত ঈসা (আ.) বা তাঁর পরবর্তী ঘটনা বলে মনে করেন। মূলত এমন কিছু হাদীস আছে, যেসব হাদীসকে ভুল বোঝা হয়েছে এই কারণে যে, এখন থেকে মাত্র ১০ কিংবা ৫ বছর পূর্বেও ওই সব হাদীসের আবেদন সুস্পষ্ট ছিল না। কারণ হিসেবে ঘটনার সাদৃশ্যহীনতা এবং আকস্মিক বৈচিত্র্য এবং যুক্তিযুক্ততা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের অভাব। বর্তমানে বিবিধ ঘটনাসমূহ ঘটার কারণেই কেবল ওই হাদীসগুলোর নিখুঁত সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়েছে। হাদীসসমূহ মূলত দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ ও শেষকালে খ্রিস্টান-ইহুদী আক্রমণ ও মুসলমানদের নির্ঘাত পরাজয়সংক্রান্ত।

প্রিয় পাঠক! এবার আসুন, আরেকজন বুদ্ধিজীবীর কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। তিনি হলেন, ডক্টর মোহাম্মাদ আলী খান মজলিশ। বইয়ের নাম হলো, 'কোরআনের আলোকে সত্যের সন্ধান'। লেখক পরিচিতি দেওয়া আছে, প্রথম জীবনে শিক্ষকতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে, পরবর্তীতে পাট গবেষণাগারে গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন,

'ইবলিস বা শয়তান এবং গন্ধম খাওয়া হলো রূপক। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে ইবলিসকে সৃষ্টি করলে ইবলিসের কী করে ক্ষমতা হলো সৃষ্টিকর্তার আদেশ অমান্য করার?.....এর ব্যাখ্যায় পরবর্তীতে তিনি লিখেছেন, ইবলিস বা শয়তান হলো, মানুষের দেহে বিভিন্ন প্রকারের হরমোন সৃষ্টি হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে যে 'ইচ্ছা' সৃষ্টি হয়। এই ইচ্ছাটিকে যখন অন্যভাবে ব্যবহার করা হয় তখন তাকেই বলা হয় ইবলিস বা শয়তান। আদম (অর্থাৎ প্রথম পুরুষ) এবং হাওয়া (প্রথম নারী) যখন ছোট ছিল, তখন তাদের মধ্যে কোনো সেক্স ছিল না। এরা বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে সেক্স হরমোন সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক সংবিধান অনুযায়ী।'

তিনি অন্য জায়গায় লিখেছেন, 'ফেরেস্তা এবং হুর-পরীও রূপক। ফেরেস্তা হলো রেকর্ডিং এজেন্ট। কোরআনেই উল্লেখ আছে, আমরা যা করছি বা বলছি তা ফেরেস্তা রেকর্ড করে রাখছে। কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ফেরেস্তার কাগজ-কলম কোথায় এবং তারা কি সব ভাষাই জানে? প্রকৃত ঘটনা হলো, ফেরেস্তা হলো আলো ও বাতাস।

তিনি লিখেছেন, পরিবেশ নষ্টের মূল কারণ পৃথিবীতে মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রের সীমাহীন অবক্ষয়, রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থপরতা এবং ধর্ম প্রচারকগণ কর্তৃক মানুষের কাছে ধর্মগ্রন্থের মূল বাণী প্রচার না করে ও রূপকের অর্থ না বুঝে রূপককেই সত্য বলে প্রচার করা। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কোরআনের সূরা ইমরান, আয়াত-৭ কতকবাণী সংবিধান, এটিই মূল কিতাব ও অপর অংশ রূপক। রূপক নিয়েই যত মতবিরোধ, ফেরেস্তাদের আবির্ভাব, হযরত মূসার নদী পার হওয়া ও ফেরাউনদের ডোবানো, হযরত ঈসার জন্ম, শবে মেরাজ, আদমের গন্ধম খাওয়া, বেহেস্ত-দোযখের বিবরণ, মৃত্যুর পর পুনরায় শরীর গঠন, (পুনর্জন্ম), কবরের যাওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদ এবং আযাব। আত্মা ও রূহ সৃষ্টিকর্তার আদেশ হলে বৈধ-অবৈধ বলি কেন? এবং তা নিয়ে এত হট্টগোল কেন?

ড. মোহাম্মাদ আলী খান মজলিশের বইটি পড়ে মনে হয়েছিল, মৃত্তিকা বিজ্ঞানী হয়ে তিনি যদি মাটি নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত থাকতেন, তাহলে হয়তো এভাবে তাঁর জীবনটা মাটি হয়ে যেত না।

বিজ্ঞ পাঠকের নিকট এখন আর খুব বেশি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন, 'কোরআন অনেককে পথভ্রষ্ট করে এবং কোরআনই অনেককে হেদায়াত প্রদান করে।'

উপরে যাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং কেউ সাধারণ শিক্ষিত নন; বরং একজন হলেন পাকিস্তানে ইসলামী গবেষণা পরিষদের প্রধান ড. ফজলুর রহমান। মেজর কাজী জাহান মিয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মাদ আলী খান মজলিশ। অথচ তাঁদের প্রত্যেকেই যে কোরআন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের সমাজে অনেকে মনে করে থাকেন, কোরআন 'বোঝার' জন্য একজন প্রফেসর হওয়াই যথেষ্ট। একজন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী কেন কোরআন বুঝতে পারবেন না?

দেখুন! কোরআন 'বোঝার' জন্য অশিক্ষিত হওয়াটাও যথেষ্ঠ। একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও কোরআন বোঝার যোগ্যতা রাখে। আল্লাহ পাক প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কোরআন 'বোঝার' যোগ্যতা দিয়েছেন, সে শিক্ষিত হোক কিংবা অশিক্ষিত। আমরা এখানে কোরআন বোঝার কথা বলেছি, কোরআনের তাফসীর বা কোরআনের ব্যাখ্যা করার কথা বলিনি। আমরা সকলেই অবগত যে রাসূল (সা.)-এর অনেক সাহাবী পড়ালেখা জানতেন না, অনেক সাহাবী বেদুঈন ছিলেন, কিন্তু তাঁরা যেভাবে কোরআন বুঝেছেন, পৃথিবীতে এভাবে আর কেউ কোরআন বুঝতে পারবে না। আল্লাহ পাক তাঁদের বুঝ, তাঁদের ঈমান, তাঁদের আমলের প্রশংসা খোদ কোরআনের বিভিন্ন

জায়গায় করেছেন।

কোরআনের বৈশিষ্ট্যই এমন যে এর সাথে কোনো যুগের কোনো গ্রন্থ তুলনীয় তো দূরে থাক, তুলনীয় হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। এটি সর্বস্তরের মানুষের জন্য হেদায়াত। সে শিক্ষিত হোক কিংবা অশিক্ষিত।

কিন্তু কোরআন বোঝার জন্য এর সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। আপনার নিজের ধারণাপ্রসূত ভ্রান্ত মতবাদকে কোরআন ব্যাখ্যার নামে চালিয়ে দেওয়াটা যে কোরআন বোঝা নয়–এ কথা একজন সাধারণ মানুষও বোঝে। যা-ই হোক! জ্ঞানের কোনো শাখায় এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে নির্দিষ্ট কিছু লোক শিখতে পারবে, আর কেউ পারবে না। তবে যেকোনো শাখায় তার মৌলিক জ্ঞান থাকা জরুরি। পৃথিবীতে যেহেতু কোরআনের শব্দে বা অক্ষরে কেউ কোনো পরিবর্তন করতে পারে না, এ জন্য মুসলিম-অমুসলিম প্রত্যেকেই কোরআনের ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকে এবং অধিকাংশ মানুষ কোরআনের তাফসীরের পথ বেছে নেয় এবং বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। একদিকে অমুসলিমরা কোরআনের অপব্যাখ্যার নিত্যনতুন পথ বের করে, অন্যদিকে 'ওরিয়েন্টালিস্ট' (প্রাচ্যবিদ) হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের একটা শ্রেণী সর্বদা কোরআনের অপব্যাখ্যা প্রচার করতে থাকে।

এদের পরিচয়ের শুরুতে যেহেতু ডক্টর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী ইত্যাদি লেখা থাকে, অনেক মুসলমান বুদ্ধিজীবীও তাঁদের দেখানো পথে অগ্রসর হয়ে ভ্রান্তির স্বীকার হয়। এবং মুসলমানদের মাঝেও ভ্রষ্টতার নিত্যনতুন দ্বার উন্মুক্ত করে।

এ জন্য কোরআন বোঝা ও কোরআনের ব্যাখ্যাদানের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোরআনের ওপর আমল করার জন্য কোরআন বোঝা শর্ত। আবার তাফসীর করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোরআনের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করল, সে যেন জাহান্নামে নিজের অবস্থান করে নিল। সুতরাং কোরআনের তাফসীর করার বিষয়টি কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়।

ডা. জাকির নায়েক যে আমাদের শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করতে বলেন, তার স্বরূপ তো আমাদের নিকট স্পষ্ট। ডা. জাকির নায়েকের বাতলানো এ পথে অগ্রসর হলে একজন সাধারণ মানুষের অবস্থা যে ড. ফজলুর রহমান, আলী খান মজলিশ–তাঁদের মতো হবে না, এর কোনো নিশ্চয়তা আছে কি? বরং প্রমাণিত সত্য হলো, যারাই ইসলামকে নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করেছে এবং পূর্ববর্তীদের অনুসৃত পথ পরিত্যাগ করেছে, তারাই পথভ্রষ্ট হয়েছে।

(চলবে ইনশা আল্লাহ)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও
সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : বাই'আত

মুহা: সুহাইল আহমদ
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ কয়েকটি দরবার শরীফের মধ্যে একটি হলো 'চন্দ্রপাড়া পাক দরবার শরীফ' আমার জানার বিষয় হলো, এই দরবার শরীফ ও এই দরবারের পীর হকপন্থী না বাতিলপন্থী, এই দরবারের পীরের হাতে মুরিদ হওয়া ও এখানে আসা-যাওয়া করা বৈধ হবে কি না, এর জন্য জায়গা বরাদ্দ করা ও দান-খায়রাত করা সাওয়াবের কাজ, নাকি গোনাহের কাজ?

সমাধান :

কোনো পীর হকপন্থী হতে হলে তার আক্বিদা-বিশ্বাস কোরআন-সুন্নাহ মতে বিশুদ্ধ হতে হয়। চন্দ্রপুরী পীর সাহেবের বিভিন্ন আক্বিদা-বিশ্বাস কোরআন-সুন্নাহবিরোধী হওয়ায় তিনি হকপন্থী পীর হতে পারেন না। যেমন–তাদের আক্বিদা-বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তা'আলা ও জিবরাঈল ফেরেশতা এক ও অভিন্ন। অলি বুজুর্গরা উঁচু স্তরে পৌঁছে গেলে আর ইবাদত-বন্দেগী করা লাগে না ইত্যাদি। অতএব এ ধরনের ভ্রান্ত আক্বিদা পোষণকারী পীরের সাথে সম্পর্ক রাখা বা তার দরবারে দান বা জায়গা বরাদ্দ কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। (সূরা যুখরুফ-১৯, সূরা মরিয়ম-৩১, শরহে আকায়েদ-১৫৩)

প্রসঙ্গ : ব্যাংক

মুহা: মুহিব্বুল্লাহ
বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের দেশের প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকে 'মুদারাবা ডিপোজিট স্কিম' নামে একটি প্রকল্প রয়েছে। যেখানে গ্রাহক মুদারাবা ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদে টাকা জমা রাখে। মেয়াদ শেষে গ্রাহককে তার মূল টাকার সাথে লাভের নির্ধারিত পার্সেন্টিস দেওয়া হয়। আমার জানার বিষয় হলো, ইসলামী ব্যাংকগুলোর উক্ত প্রকল্পে এভাবে টাকা জমা রেখে লাভ নেওয়া আমার জন্য বৈধ হবে কি না? এবং এ ক্ষেত্রে উক্ত টাকা দিয়ে তারা কোন ধরনের ব্যবসা করছে এবং কোন পদ্ধতিতে করছে, তা জানা আমার জন্য আবশ্যক কি না? যদি এ সম্পর্কে আমার বিস্তারিত জানা থাকে তাহলে কোনো সমস্যা আছে কি না? অর্থাৎ এর কারণে আমার জন্য মুনাফা গ্রহণ বৈধ-অবৈধ হওয়ার পেছনে এর কোনো প্রভাব আছে কি না?

সমাধান :

ইসলামী ব্যাংকগুলো যেহেতু শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে মুদারাবা ডিপোজিট পরিচালিত করার দাবি করে, তাই যাচাই করে বিপরীত কিছু পাওয়া না গেলে, তাদের সাথে লেনদেন করার অবকাশ আছে। (আদ্দুররুল মুখতার ৫/৬৪৭)

প্রসঙ্গ : মহিলাদের মাহফিল

মুফতী নুরুদ্দীন
ধোবউরা, মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় প্রচলিত মহিলা ওয়াজ মাহফিলের প্রথা আছে, ওয়াজ মাহফিলে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাপক হারে শুধু মহিলাদেরকে একত্রিত করা হয়। পুরুষ মানুষ পর্দার আড়াল থেকে মহিলাদের উদ্দেশে বয়ান করেন। আরেকটি প্রথা আছে, কোনো এক ব্যক্তির বাড়িতে পুরো মহল্লার মহিলারা জমা হন এবং তাঁদের মধ্যে একজন দ্বীনি কথাবার্তা ও তা'লীম করেন। জানার বিষয় হলো, উক্ত প্রথাগুলো শরীয়তসম্মত কি না? যদি শরীয়তসম্মত না হয় তাহলে যে হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা.) ঈদের নামাযের পর মহিলাদের উদ্দেশে সদকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বয়ান করেছিলেন– এর জবাব কী হবে?

সমাধান :

ইসলামের মৌলিক আক্বিদাসমূহ, নামায, রোজা ও পবিত্রতার মাসায়েল, পর্দার শরয়ী বিধান, স্বামীর হক, এরূপ কিছু জরুরি বিষয়ের শিক্ষা অর্জন করা মহিলাদের জন্য ফরজ। আর এ বিষয়গুলো সাবালিকা হওয়ার পূর্বে মক্তবে বা অভিভাবকের কাছে কিংবা বিবাহের পর স্বামীর তত্ত্বাবধানে ঘরোয়া পরিবেশে অর্জন করবে। বর্তমানে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়াটাই

ফেতনা-ফ্যাসাদের কারণ। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত পন্থায় আনুষ্ঠানিকভাবে মহিলাদের ওয়াজ মাহফিল ও তা'লীমের অনুমতি শরীয়তে নেই।

উল্লেখ্য যে মহিলাদের ঈদের জামা'আতে অংশগ্রহণের বিষয়টি ছিল ইসলামের সূচনালগ্নে, যখন মহিলাদের বাইরে বের হওয়াটা তেমন ফেতনার কারণ ছিল না। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.)-এর যামানায় ফেতনার প্রবল আশংকার কারণে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত বহাল আছে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৮৩, ফাতহুল কাদীর ১/৩৬৬)

প্রসঙ্গ : জমি রেজিস্ট্রি

মাও. মুহাম্মদ আলী
নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

জিজ্ঞাসা :

আমি প্রায় ২৫-৩০ বছর হয়েছে কিছু জমি ক্রয় করে ভোগ করে আসছি; কিন্তু রেজিস্ট্রি করা হয়নি। রেজিস্ট্রি না থাকার কারণে আমি উক্ত জমির প্রকৃত মালিক হব কি না, এদিকে বিক্রেতাও প্রায় ২০-২২ বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। তাই বর্তমানে বিক্রেতার ওয়ারিশগণ উক্ত জমির রেজিস্ট্রি দিতে বাধ্য কি না? আমার কাছে দলিলপত্র না থাকার অজুহাতে বিক্রেতার ওয়ারিশগণ উক্ত বিক্রয়কৃত জমি নিজেদের প্রাপ্য দাবি করার কোনো সুযোগ আছে কি না?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে জমির ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার জন্য রেজিস্ট্রি করা শর্ত নয়। বিধায় আপনি বাস্তবেই মৌখিকভাবে ক্রয় ও মূল্য পরিশোধ করে থাকলে শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত জমির মালিক সাব্যস্ত হবেন। এ ক্ষেত্রে ওয়ারিশগণের নৈতিক দায়িত্ব হলো, বিক্রীত জমি রেজিস্ট্রি করে দেওয়া। ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও দাবি করে থাকলে তারা গোনাহগার হবে। অন্যথায় তাদের দাবি করার অধিকার আছে। এ ক্ষেত্রে ক্রয় সূত্রে আপনার মালিকানা কমপক্ষে দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ৪/৫০৪, আল বাহরুর রায়িক ৫/৪৩৯)

প্রসঙ্গ : বীমা

মাও. নজরুল ইসলাম
হোমনা, কুমিল্লা।

জিজ্ঞাসা :

বীমার শরয়ী হুকুম কী? এবং কোনো ধরনের বীমা শরীয়তের আলোকে জায়েয আছে কি না? 'ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স' করা শরীয়তসম্মত কি না? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কোনো ব্যক্তি তাতে অংশগ্রহণ করে থাকলে তার করণীয় কী?

সমাধান :

বীমার মাঝে সুদ ও জুয়া থাকার কারণে প্রচলিত সব ধরনের বীমা নাজায়েয ও হারাম। অভিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরামের তাহকীক অনুযায়ী প্রচলিত 'ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স' শরীয়তসম্মত নয়, বরং হারাম। সুতরাং কেউ যদি না জেনে করে থাকে তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করবে এবং মূল টাকা তার জন্য হালাল। সুদের টাকা তার জন্য বৈধ নয়। (সূরা বাকারা ১৭৮, মুসলিম ২/২৭)

প্রসঙ্গ : মসতুরাতের জামা'আত

মাও. আসাদুজ্জামান
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের দেশে প্রচলিত তাবলীগে মসতুরাতের জামা'আত শরীয়তের আলোকে বৈধ কি না? আর এভাবে দ্বীনের তাবলীগ করার জন্য রাসূল (সা.)-এর যুগে বা সাহাবাদের যুগে মহিলারা জামা'আত আকারে বের হয়েছেন কি না?

সমাধান :

মহিলাদের জন্য পর্দা করা কোরআন-হাদীসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত একটি ফরজ বিধান। শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলারা ঘরে অবস্থান করতে নির্দেশিত। বিশেষ শরয়ী ও মানব প্রয়োজন ছাড়া তাদের বাইরে গমনের অনুমতি নেই। দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব শরীয়ত মহিলাদের ওপর অর্পণ করেনি। উপরন্তু দ্বীনের তাবলীগের জন্য রাসূল (সা.) বা সাহাবায়ে কেরামের যুগে মহিলারা জামা'আত আকারে কখনো বের হয়নি। বিধায় আমাদের দেশে প্রচলিত মসতুরাতের জামা'আত শরীয়ত সমর্থিত বলা যায় না। (সূরা আহযাব ৩২-৩৩, বুখারী ১/১২০)

প্রসঙ্গ : সংক্রামক ব্যাধি

মুহা: আনোয়ার হুসাইন
উখিয়া, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

আমার এক বন্ধুর বাবার হোটেলের জন্য একজন লোক দরকার, আমি তাঁকে বললাম, ভাই! আমার লোক আছে। কিন্তু আমার সেই লোকের হাঁপানি রোগ আছে। আমার বন্ধু আমাকে বলল, অসুবিধা নেই। পাঠিয়ে দেন–তাঁর জন্য আলাদা প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি রাখা হবে। জানার বিষয় হলো, হাঁপানি রোগ সংক্রামক ব্যাধি কি না? আমি যে লোকটিকে বন্ধুর বাবার হোটেলে পাঠাচ্ছি, সে লোকটির রোগের বিবরণ আমার বন্ধুর বাবা, অর্থাৎ হোটেলের

মালিককে দিতে হবে কি না? আর হাঁপানি রোগ যদি সংক্রামক ব্যাধি হয় উল্লিখিত লোককে আমার বন্ধুর বাপের হোটেলে দেওয়ার কারণে যদি কোনো মানুষ আমার দেওয়া লোকটির পান করা পানি বা খাবার খাওয়ার কারণে হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, তবে কি আমি গোনাহগার হব? উপরোল্লিখিত লোককে হোটেলের গ্রাহকদের খেদমতের জন্য দেওয়া বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

আল্লাহ তা'আলার হুকুম ছাড়া কোনো ধরনের রোগ-ব্যাধি নিজস্ব ক্ষমতাবলে সংক্রমণ করতে পারে না। তবে সংক্রমণের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মানুষের ঈমান বাঁচাতে কঠিন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংশ্রব থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়ে থাকে। হোটেল মালিক যদি শ্রমিক নিয়োগের জন্য হাঁপানি রোগ না থাকার শর্ত করে থাকেন তবে হাঁপানি রোগ গোপন করে তাঁর হোটেলে চাকরি নেওয়া বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে এরূপ কোনো শর্ত না করে থাকলে অযথা তাঁর কাছে রোগ প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। তা ছাড়া হাঁপানি দৃশ্যমান এমন কোনো রোগ নয়, যার ফলে হোটেলের কাস্টমারদের ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে। তাই অহেতুক এ বিষয়ে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। (মিশকাত ২/৩৯১)

প্রসঙ্গ : খতম তারাবীহ

হাফেজ ফখরুল ইসলাম
সোনাগাজী, ফেনী।

জিজ্ঞাসা :

খতম তারাবীহ পড়িয়ে বিনিময় দেওয়া-নেওয়া জায়েয কি না? খতম তারাবীহ পড়িয়ে হাদিয়ার নামে আর্থিক লেনদেন জায়েয কি না?

সমাধান :

খতম তারাবীহ পড়িয়ে বিনিময় দেওয়া-নেওয়া বা হাদিয়ার নামে আর্থিক লেনদেন কোনোটিই জায়েয নেই। (মিশকাত ১/১৯৩, রদ্দুল মুহতার ৬/৫৬)

প্রসঙ্গ : তাবলীগ

মুহা: সুলাইমান
কাশিয়ানী, ফরিদপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমরা যখন তাবলীগে যাই তিন দিন, চল্লিশ দিন বা চার মাসের জন্য তখন থাকা-খাওয়া মসজিদেই করতে হয়, কোনো কোনো আলেম সাহেবান বলেন, মসজিদে থাকা-খাওয়া জায়েয নেই মসজিদ ইবাদত অর্থাৎ যিকির, তেলাওয়াত ও নামাযের জায়গা, এখন জানার বিষয় হলো, মসজিদে খাওয়া, ঘুমানো ঠিক হবে কি না?

সমাধান:

তাবলীগ জামা'আতের লোকদের জন্য দাওয়াতে তাবলীগের উদ্দেশ্যে ইতি'কাফের নিয়্যাতে মসজিদে প্রবেশ করার পর প্রয়োজনে সেখানে খাওয়া ও ঘুমানোর অনুমতি আছে, তবে সর্বাবস্থায় মসজিদের পবিত্রতা ও আদবের প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক। (শামী ৫/৩২১, আদ্দুররুল মুখতার ১/৯৩-৯৪)

প্রসঙ্গ : মাদরাসা

মাও. আব্দুর রহমান
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

জিজ্ঞাসা :

মুসলমানরা মাদরাসার ভবন নির্মাণের জন্য যে টাকা দান করেন। ভবন নির্মাণের পূর্বে অথবা ভবন নির্মাণের পর ওই টাকা থেকে শিক্ষকের বেতন দেওয়া জায়েয হবে কি না?

সমাধান :

মাদরাসার ভবন নির্মাণকে কেন্দ্র করেই যদি মুসলমানরা টাকা দান করে থাকেন, তাহলে তাঁদের সম্মতি ছাড়া উক্ত টাকা দ্বারা শিক্ষকের বেতন দেওয়া বা অন্য খাতে ব্যয় করা বৈধ হবে না। (ফাতাওয়া কাযিখান ৪/২৯৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৬/৪৬৪)

প্রসঙ্গ : ইল্লাল্লাহ যিকির

মুহা: শফিকুল ইসলাম
নরসিংদী।

জিজ্ঞাসা :

শুধুমাত্র 'لا اله' বলে যিকির করা যাবে কি? একজন আলেম বলেছেন, কয়েকবার 'لااله الا الله' বলে তারপর শুধু 'الا الله' বলে যিকির করা বৈধ হবে। বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব?

সমাধান :

'لااله الا الله' এরপরে শুধু الا الله এর যিকির বৈধ। অনুরূপ لا موجود বা لا محبوب এর ধ্যান বা বিশ্বাস নিয়ে শুধু الا الله এর যিকিরও বৈধ। এ ক্ষেত্রে مستثنى منه উহ্য থাকায় আরবী ব্যাকরণের দিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। হাদীস শরীফে এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে। তবে الا الله এর যিকির 'لااله الا الله' এর পরে করাই শ্রেয়। (ওমদাতুল কারী ২/১৬৫, এমদাদুল ফাতাওয়া ৫/২২৩)

প্রসঙ্গ : কুড়ানো বস্তু

মুহা: হুমায়ুন কবির
দিগারকান্দা, ময়মনসিংহ।

জিজ্ঞাসা :

কারো হারিয়ে যাওয়া জিনিস পাওয়া গেলে কী করা উচিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব?

সমাধান :

কারো হারিয়ে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে পেলে তত দিন পর্যন্ত এ'লান করবে, যত দিন পর্যন্ত মালিক ওই জিনিসটি তালাশ করবে বলে প্রবল ধারণা হয়।

এর পরও যদি মালিকের সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে নিজে গরিব হলে বস্তুটি ব্যবহার করতে পারবে। ধনী হলে গরিবকে সদকা করবে। সদকা করার পর যদি মালিকের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সে সদকা মেনে নেয়, তবে জরিমানা দিতে হবে না। আর যদি সে ফেরত চায় তবে জরিমানা দিতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ৪/২৭৯, ফাতাওয়া দারুল উলুম ১২/৪৫৬)

প্রসঙ্গঃ বডি স্প্রে ব্যবহার

মুহাঃ জিহাদুল ইসলাম
রূপসী, নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

বডি স্প্রে এবং সেন্ট ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না?

সমাধান :

বডি স্প্রে বা সেন্ট এর মধ্যে কোনো নাপাক বস্তুর সংমিশ্রণ না থাকা নিশ্চিত হলে তা ব্যবহার করা অবশ্যই জায়েয হবে। পক্ষান্তরে নাপাক বস্তুর সংমিশ্রণ থাকা নিশ্চিত হলে তা ব্যবহার করা নাজায়েয। আর সংমিশ্রণের নিশ্চিয়তা না থাকলে ব্যবহার করা বৈধ হলেও সতর্কতামূলক ব্যবহার না করাই শ্রেয়। (রদ্দুল মুহতার ৬/৪৫৩)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

ডা. এম এ আলীম খান
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

জিজ্ঞাসা-১

মসজিদ কমিটির সভাপতি ও মোতাওয়াল্লী কর্তৃক নিয়োগকৃত নন এমন আলিয়া মাদরাসার অর্ধ শিক্ষিত ব্যক্তি মারামারি করে পূর্বের কোরআনে হাফেয যিনি ২৮ বছর ধরে ইমামতি করিতেছিলেন তাঁকে জোরপূর্বক বের করে দিয়ে ইমামতি করলে ওই ইমামের পেছনে নামায হবে কি না?

সমাধান-১

প্রশ্নে বর্ণিত আলিয়া মাদরাসায় পড়া অর্ধ শিক্ষিত ব্যক্তি যদি শরীয়তসম্মত কোনো কারণ ব্যতীত জোরপূর্বক মারামারি করে পূর্বের নির্ধারিত ইমামকে বের করে দেয় তাহলে এটা তার পক্ষ থেকে জুলুম এবং কবিরা গোনাহ হবে। অতএব এমন ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমি। (মিশকাত ১০০, আদ্দুররুল মুখতার ১/৮৩)

জিজ্ঞাসা-২

ফরজ নামাযের পর পর রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো মুনাজাত করেছেন কি না? কোরআন-হাদীস মতে ফরজ নামাযের পর মুনাজাতের বিধান কী?

সমাধান-২

ফরজ নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) মুনাজাত করেছেন। তাই ফরজ নামাযের পর মুনাজাত করা মুস্তাহাব। (আল মু'জামুল কবীর তাবারানী ১১/২২, ইলাউস সুনান ২/৯৯৯)

জিজ্ঞাসা-৩

ঝগড়া-বিবাদ মেটানোর জন্য মসজিদ স্থায়ী বা সাময়িকভাবে বন্ধ করা যায় কি না? এবং অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় কি না?

সমাধান-৩

ঝগড়া-বিবাদ মেটানোর জন্য মসজিদকে স্থায়ী বা সাময়িকভাবে বন্ধ করা যাবে না এবং অন্যত্র স্থানান্তরও করা যাবে না। বরং ঝগড়া মেটানোর অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৪০০)

জিজ্ঞাসা-৪

জোরপূর্বক চাঁদা উঠিয়ে এবং কোরবানীর গোশতে গরিবের অংশ বিক্রি করে ইমামের বেতন দেওয়া যায় কি না?

সমাধান-৪

জোরপূর্বক চাঁদা উঠিয়ে বা কোরবানীর গোশত গরিবদের দেওয়ার পূর্বে বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে ইমামের বেতন দেওয়া যাবে না। তবে যদি গোশত গরিবদের দিয়ে দেওয়ার পর তারা স্বেচ্ছায় বিক্রি করে ফেলে এবং তার মূল্য দিয়ে ইমামের বেতন দেয় তাহলে বৈধ হবে। (বুখারী ১/২৩২, আসসুনানুল কবির লিল বায়হাকী ৬/১০০)

প্রসঙ্গ : ভিডিও

মুহাঃ রবিউল ইসলাম
মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

ইন্টারনেট অথবা টিভি মিডিয়াতে দ্বীন প্রচারের জন্য জুমু'আর পূর্ব বয়ান অথবা ওয়াজ মাহফিলের বয়ান ভিডিও করা ঠিক কি না? আর প্রচারিত ভিডিও দেখা বৈধ কি না?

সমাধান :

ইন্টারনেট অথবা টিভি মিডিয়াতে দ্বীন প্রচারের জন্য জুমু'আর পূর্ব বয়ান অথবা ওয়াজ মাহফিলের বয়ান ভিডিও করা বা করানো মূলত ছবি তোলার নামান্তর। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয। মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর ছবি তোলা হলে কিয়ামতের দিন অত্যন্ত কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। তা ছাড়া বর্তমানে দ্বীন প্রচারের নামে বয়ান বা ওয়াজ ভিডিও করা বা করানো অসংখ্য গোনাহের উৎস, তাই তা সম্পূর্ণ নাজায়েয। এই নাজায়েয ভিডিও দেখাও বৈধ হবে না। (বুখারী ২/৮৮০, ওমদাতুল কারী ২২/৭০)

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ

চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩